Testimony of Journalists

on swelled sufferings of Aila hit people in one year

আইলাদুর্গত মানুষের এক বছরের জীবন-যন্ত্রণা নিয়ে **সাংবাদিকের সাক্ষ্য**

সাংবাদিকের সাক্ষ্য

Testimony of Journalists

আইলাদুর্গত মানুষের এক বছরের জীবন-যন্ত্রণা নিয়ে

on swelled sufferings of Aila hit people in one year

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা
মোবাশ্বার হাসান, অক্সফাম

Planning and Editing
Mubashar Hasan, Oxfam

সম্পাদনা সহায়তা
সমষ্টি, সেলিম কামাল, তানিম আহমেদ এবং ইউসুফ মোহাম্মদ

Editing Assistants
SoMaSHTe, Selim Kamal, Tanim Ahmed and Yousuf Muhammad

প্রচ্ছদচিত্র
আবির আবদুল্লাহ
ইউরোপিয়ান প্রেস ফটো এজেন্সি (ইপিএ)

Cover Photo
Abir Abdullah,
Europeans Press Photo Agency (EPA)

শেষ প্রচ্ছদ
মোবাশ্বার হাসান

Back Cover Photo
Mubashar Hasan

অঙ্গসজ্জা
অর্ক

Deisgn
Arka

ছবি
এন্ড্রু বিরাজ: থমসন রয়টার্স,
আনিসুর রহমান: ডেইলি স্টার,
মনিরুল ইসলাম, আবির আবদুল্লাহ: ইপিএ
ও মোবাশ্বার হাসান

Photo
Andrew Biraj: Thomson Reuters,
Anisur Rahman: Daily Star,
Moneerul Islam, Abir Abdulla: EPA
and Mubashar Hasan

প্রকাশক
গ্রামীণ জীবনাযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান (সিএসআরএল) এবং ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট (ইসিবি) বাংলাদেশ কনসর্টিয়াম

Publisher
Campaign for Sustainable Rural Livelihoods (CSRL) and The Emergency Capacity Building (ECB) Project Bangladesh Consortuim

প্রকাশনা সহায়তা
ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট (ইসিবি) বাংলাদেশ কনসর্টিয়াম

Publication Support
The Emergency Capacity Building (ECB) Project Bangladesh Consortium

প্রকাশকাল
মে ২১, ২০১০

Publishing year
May 21, 2010

বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রকাশিত লেখাসমূহের মতামত লেখকদের নিজস্ব। এর সাথে সিএসআরএল ও ইসিবি একমত নাও হতে পারে। ছবিসমূহের স্বত্ত্ব ফটো সাংবাদিকদের।

Disclaimer: Published write-ups reflect writers' personal opinion. ECB and CSRL do not necessarily agree with these opinions. Photographers contributed in this testimony own the rights of their photos.

সূচি Content

যে নরকে আগুন নেই, পানি আছে : আশীফ এন্তাজ রবি ____ ৫
সিনিয়র সহ সম্পাদক, দৈনিক যুগান্তর

Victims of a broken promise: Nicolas Haque ____ 7
Correspondent, Al Jazeera English

আলোছায়ায় আইলা বিধ্বস্ত মুখ : পাভেল রহমান ____ ৮
ফটোসাংবাদিক, এসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)

The poor ye shall always have with you: Tanim Ahmed ____ 9
Assistant Editor, bdnews24.com

নোনা রুখতে বাঁধ, নোনা বাড়াতেও বাঁধ : গৌরাঙ্গ নন্দী ____ ১২
ব্যুরো চিফ, খুলনা, দৈনিক কালের কণ্ঠ;
প্রদায়ক, বিবিসি বাংলা

Gabura: Where Aila hits daily: Muktadir Rashid ____ 15
Staff Correspondent, The Daily New Age

ঝড় থেমেছে কান্না থামেনি : শামীম আল আমিন ____ ১৬
বিশেষ প্রতিনিধি, চ্যানেল ওয়ান

Testimony of a witness to the Aila havoc: Abir Abdullah ____ 18
Photojournalist, European Press-photo Agency (EPA), Bangladesh Bureau

পলায়নপর আমি : জুলহাস আলম ____ ২০
প্রতিনিধি, এসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)

Photo Testimony of the Aila Havoc: Andrew Biraj ____ 21
Photograpaher, Thomson Reuters, Bangladesh Bureau

সাংবাদিকের দিনলিপিতে 'আইলা কষ্ট'! : পান্থ রহমান ____ ২২
সিনিয়র স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, চ্যানেল আই

The nexus of nature and corruption produces endless miseries in a storm-hit land: Wasim Bin Habib ____ 25
Staff Correspondent, The Daily Star

সেই কবে আইলা তারপর এতো দিনেও... : ঝুমুর বারী ____ ২৭
সিনিয়র রিপোর্টার, আর টিভি

Testimony of a cruel game: Tapos Kanti Das ____ 29
Staff Correspondent (Khulna), The Daily New Age

গাবুরা থেকে কোপেনহেগেন, আবার গাবুরা... : মনজুরুল করিম ____ ৩০
স্টাফ রিপোর্টার, এনটিভি

মুখবন্ধ

নিরাবেগ নিস্পৃহতার সীমানা পেরিয়ে

অবশেষে বর্ষপূর্তির পূর্বমুহূর্তে গৃহপ্রত্যাবর্তন শুরু করেছেন কিছু কিছু মানুষ, যদিও তাতে জীবনমানের দৃশ্যমান হেরফের হবে না কোনওক্রমেই বরং ক্ষেত্রবিশেষে হতে পারে তার অবনতি; তবুও নিজ ঘর তো বটে! ২০০৯ সালের ২৫ মে'র ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত জনপদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিপর্যয়কর অবস্থায় নিপতিত হয়েছিল খুলনা-সাতক্ষীরার কয়রা-দাকোপ-শ্যামনগরের ১১টি ইউনিয়ন। এক বছর ধরে প্রায় চার লাখ মানুষের জীবন ভেসেছে নিত্য; স্রোতে, ভাঙা বাঁধ দিয়ে জোয়ার-ভাটার লোনাপানির প্রতিদিনের যাওয়া-আসায়।

কিন্তু মানবতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। প্লাবিত জনপদগুলোর সংগ্রামী মানুষেরা আর খুলনা-সাতক্ষীরা-রাজধানীর সহমর্মী মানুষেরা, তাদের প্রতিষ্ঠানসমেত, যার যার মতো একক ও সমবেতভাবে চেষ্টা করেছেন নীতি-নির্ধারকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে। এমনকি নীতি-নির্ধারকদেরও কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন জনজীবনের দুর্ভোগ লাঘবের; কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্যুরোক্রেসি যে নিত্যই উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অবাধ্য হবার প্রয়াস পায় তার প্রমাণ এক্ষেত্রে প্রকটভাবে চোখে-মনে জ্বালা ধরিয়েছে। তত্ত্বকথা বলে: এই অবাধ্যতার শাস্তি না দিলে, এবং চিরতরে বন্ধ করার প্রয়াস না নিলে, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দেশ পরিচালনার নৈতিক অধিকার হারান, উপনিবেশোত্তর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পরিণত হন ঔপনিবেশিক ব্যুরোক্রেসির আজ্ঞাবহ তল্পিবাহকে।

সুতরাং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে খোঁজ নিতে হবে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ড কিভাবে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অমান্য করে বোর্ডের ঠিকাদার, বড় চিংড়ি ব্যবসায়ী ও তাদের সুবিধাভোগী স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের সঙ্গে যোগসাজসের মাধ্যমে প্রায় চার লাখ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে। শীতকাল পুরোটা পার হয়েছে; বৃষ্টিপাত-ঝড়ঝঞ্ঝা-জলোচ্ছ্বাসের কাল শুরু হয়েছে- যারা গৃহে ফিরেছেন ও ফিরছেন, যারা এখনো বাঁধের উপর রয়ে গিয়েছেন, এই মৌসুমে তারা নিরাপদ- এই নিশ্চয়তা কে দেবে?

নিশ্চয়তার দাবিতে সক্রিয়তা বহমান গত এক বছর প্রায়। খুলনা-সাতক্ষীরার কয়রা-দাকোপ-শ্যামনগরের ১১টি ইউনিয়নের জনগণ এবং তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ (যদিও সকলেই নন, মূলত ইউনিয়ন পরিষদের

Preface

Beyond diabolical apathy

Slowly but surely, people have at last begun to return to their homesteads almost a year after Cyclone Aila had destroyed their livelihoods and shelters. It is very unlikely they will be returning to a distinctly better life. In fact it might worsen for some. But nonetheless even misery might seem bittersweet under one's own roof. The people of 11 unions of Koyra-Dacope-Shyamnagar in Khulna-Shatkhira districts were the worst affected on May 25, 2009 when Aila unleashed her fury. Since then, for almost the entire year, the fates of about 400,000 people have floated up and down along with the tides falling and rising.

But that has hardly defeated the human spirit. The people of those coastal areas stood up against all odds while sympathetic people of Khulna, Shatkhira and the capital city expressed their solidarity by all means to get the attention of policymakers. Even some of the policymakers tried to highlight the dire plight of the people. But the ghost of bureaucracy that Bangladesh has unfortunately inherited from the colonial era has sunk its roots deep. That sinister red tape defied even today's policy makers in such a tangle that one cannot help but feel enraged and cry out for the harshest punishment for those responsible. Theoretically, if the political authority of the state does not punish such disobedience, it loses moral authority to govern. In such a case the post colonial political authority becomes nothing but a subservient of that colonial bureaucracy.

So it is an obligation of the state to investigate how a government agency like the Water Development Board has the audacity to work in favor of certain moneyed quarters, directly opposing directives of the Prime Minister herself as well as the Minister for Food and Disaster Management. The entire winter has passed and the embankments are still not fully

জনপ্রতিনিধিগণ; অন্যদের ব্যাপারে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন) যখনই সুযোগ পেয়েছেন মন্ত্রী ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কাছে বাঁধ পুনর্নির্মাণের দাবি তুলে ধরেছেন। সকল রাজনৈতিক দল ও সামাজিক আন্দোলনের সমন্বয়ে গঠিত সাতক্ষীরার 'আইলায় বিধ্বস্ত বাঁধ নির্মাণ গণসংগ্রাম কমিটি' ও খুলনার 'আইলা দুর্গত সংহতি মঞ্চ' ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত করেছে গণআন্দোলন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়গুলোতে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করেছে স্থানীয় বাস্তবতার তথ্য ও জনদাবিসমূহ। উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরাও তাদের মতো করে তদবির করেছেন যাতে এই বর্ষা শুরুর আগে শেষ হয় বাঁধ পুনর্নির্মাণ। 'গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান' ও 'নাগরিক সংহতি' রাজধানীতে আয়োজন করেছে একের পর এক কর্মসূচি। ছয়টি আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনের জোট 'ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট-ইসিবি' এবং ইকো'র পার্টনার, যেগুলো আইলাদুর্গত এলাকায় সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালনা করছিল কাজ-খাদ্য-স্বাস্থ্য-পানীয় প্রদানের কর্মসূচি, বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল অনতিবিলম্বে বাঁধ নির্মাণ শেষ করার আর আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদানের। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করেছিল উল্লিখিত সকল সংবাদ।

গণমাধ্যমকর্মীগণ অনেকে ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছিলেন সরেজমিন প্রতিবেদনের প্রণয়নে; গিয়েছেন অকুস্থলে। প্রথাগত প্রতিবেদন তারা প্রণয়ন করেছেন; কিন্তু পরিস্থিতি তাদের বাধ্য করেছে নিরাবেগ নিস্পৃহতার সীমানাও পেরোতে; তারা তো রোবোট নন যে কেবল বাইনারি সংকেতঋদ্ধ সংবাদ উৎপাদন করে যাবেন অনবরত। নিরাবেগ নিস্পৃহতার সীমানা পেরুনো কিছু অনুভবসংকলন এই সাংবাদিকের সাক্ষ্য।

কোন আদালতে এই সাক্ষ্য? মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিমান। বি হিউম্যানকাইন্ড।

জিয়াউল হক মুক্তা
সদস্য সচিব
গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান (সিএসআরএল)

repaired. The people who are returning to their homestead and those who will return are still faced with the same dilemma that they did through the year — would they be safe? But who will guarantee their safety? Who will vouch for their protection?

But this demand for some sort of guarantee has been voiced ever since Aila. It was not just the union level public representatives who waged their movements (with exceptions of course) to attract the attention of the higher authorities, but there were also citizens' initiatives in Khulna and Shatkhira under two banners of 'Ailai Bidhostho Badh Nirman Gono Shongram Committee' and 'Aila Durgoto Shonghati Moncho' combining the social and political forces of the districts. They have repeatedly sent reports of what were happening on the ground the needs of the people to the highest public offices of this republic including the Prime Minister's Office. The Upazila and District Administrations have lobbied too for completing the repair work before the rains come. The Campaign for Sustainable Rural Livelihoods and Nagorik Shanghati have organised series of events. Six international non-government organizations under the banner of 'Emergency Capacity Building Project' and partners of ECHO that had been working in the Aila-affected areas, also came together to strongly ask for expediting the repair works. But all the publicity through the organisations or through the public media seems have had no real impact whatsoever.

The journalists had given this issue much priority. They went to the affected areas and filed detailed reports. But the prevailing situation born of a diabolical apathy compelled them step out of the infamously clinical objectivity expected of journalists. They have proven they are not robots by producing the news through following binary signals continuously. This publication is merely a compilation of their sentiments in that context. It is their testimony, a testimony for humanity.

In which court should these testimonies be placed? Human beings are the greatest and the strongest. Be Humankind.

Ziaul Hoque Mukta
Member Secretary
Campaign for Sustainable Rural Livelihoods (CSRL)

যে নরকে আগুন নেই, পানি আছে

আশীফ এন্তাজ রবি

পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে। পুণ্যবান এবং পাপী মানুষ। মৃত্যুর পর পুণ্যবানেরা স্বর্গবাসী হন আর যারা পাপী, তাদের স্থান হয় নরকে বা জাহান্নামে। পৃথিবীর মানুষ যাতে অন্যায় বা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকেন, এজন্য প্রায় সব ধর্মগ্রন্থেই নরকের ভয়াবহ বর্ণনা দেওয়া আছে। নরকে আছে আগুন, সেই আগুনে পাপীতাপি মানুষ জ্বলে-পুড়ে ছারখার হবে, সেই অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সেই সব পাপী মানুষেরা মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু তাদের মরণ হবে না, তারা সেই আগুনে জ্বলতে থাকবে, পুড়তে থাকবে অনন্তকাল। খুলনা এবং সাতক্ষীরার আইলাদুর্গত এলাকায় একবার ঘুরে আসলে নরক সম্পর্কে আপনার ধারণাই বদলে যাবে। আগুন ছাড়াও যে কেবলমাত্র লোনাপানি দিয়ে একটি নরক গড়ে উঠতে পারে - এই এলাকায় একবার না এলে সে কথা আপনি বুঝবেনই না।

পৃথিবী ইদানীং অনেক সভ্য হয়েছে। মানুষ এবং কুকুরের মতো আজকাল ঝড়েরও নাম দেওয়া হয় নার্গিস, সিডর ইত্যাদি। ২০০৯ সালের ২৫ মে যে ঝড়টি এই এলাকায় আঘাত হানে, তারও একটি গালভরা নাম আছে, আইলা।

ঝড়টির ফলে খুলনা এবং সাতক্ষীরা জেলার ৭১১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বেড়িবাঁধ ভেঙে ১৩টি ইউনিয়নের বিশাল এলাকা পানির নিচে সম্পূর্ণ তলিয়ে যায়। ঝড়ের সময় বাঁধে আশ্রয় নেওয়া মানুষগুলোর আর ঘরে ফেরা হয় না। দীর্ঘ এক বছরেও তারা ঘরে ফিরতে পারেনি, ফিরে পায়নি তাদের চাষের জমি। ক্যামেরার বহর নিয়ে আসে সংবাদকর্মীরা। তাদের অস্থিচর্মসার চেহারার ছবি তোলা হয়। সেই ছবি দেশ-বিদেশের নানা পত্রিকায় ছাপা হয়। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে শহুরে মানুষরা বলে, হোয়াট এ পিটি! পত্রিকার কাটতি বাড়ে, ফটোগ্রাফারের প্রমোশন হয়, আইলাদুর্গত মানুষগুলোর ভাগ্যের কোনও পরিবর্তন হয় না।

স্থানীয় প্রশাসন বাঁধ মেরামতের জন্য টেন্ডার ডাকে। বাঁধের উপরের মানুষগুলো আশায় বুক বাঁধে। টেন্ডারের শর্তগুলো পছন্দ হয় না বলে স্থানীয় ঠিকাদাররা একযোগে টেন্ডার বয়কট করে। বাঁধের কাজ ঝুলে পড়ে। আমলাতন্ত্রের প্যাঁচগুলো আরও জোরালো হয়, সরকারি ফাইলের লাল ফিতার রঙ ফ্যাকাশে হতে থাকে। একসময় সেই বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হয়। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই বাঁধ আবার ভেঙে যায়। পুনর্বার টেন্ডার ডাকা হয়, অর্থ বরাদ্দ হয় আরেকবার। ঠিকাদারের পকেট ভারি হয়, আইলা-আক্রান্ত মানুষদের পেটের চামড়া পিঠের সঙ্গে লেগে যায়। আর প্রভাবশালীরা এই বাঁধ মেরামতের খেলায় মেতে ওঠেন। আসে ত্রাণ। ত্রাণ মানেই জনপ্রতিনিধিদের পোয়াবারো। ত্রাণ বিলাতে গিয়ে যে জনপ্রতিনিধির একটি বাইসাইকেলও ছিল না, তিনি এখন প্রাইভেট কারে চলাফেরা করেন। গোলপাতা দিয়ে বানানো তার বাসগৃহ পরিণত হয় পাকা বিল্ডিংয়ে, অন্যদিকে আইলাদুর্গত মানুষ বাঁধের উপর অসহনীয় শীতে কষ্ট পান। এলাকার মানুষদের ঘর নেই, জমি নেই, কাজ নেই, খাবারের পানিটুকুর জন্য তাদের ছুটতে হয় সাত মাইল দূরে।

সব বাধা পেরিয়ে এইসব মানুষদের হাতে মাঝে মাঝে রিলিফের চাল আসে। দীর্ঘদিনের ক্ষুধাকাতর মানুষ সেই চাল রান্না করার জন্য নদী সাঁতরে ওপারে যায় কাঠ আনতে। ওপারে সুন্দরবন। গতমাসেই একজন বাঘের পেটে গিয়েছে। ক্ষুধায়, বিনা চিকিৎসায় এখানকার মানুষজন মরে, মরার সময় তাদের মুখে এক ফোঁটা পানি দেবার মতো সুপেয় পানি নেই। মরার পর তাদের কবর দেবার মতো এক টুকরো শুকনো জমিও নেই কোথাও।

দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে এইসব মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়ে, চোখের পানি গাল গড়িয়ে মাটিতে পড়ার আগেই তারা চোখ মুছে ফেলে।

মানুষের তৈরি এই নরক দেখে স্বয়ং ঈশ্বরও হতবাক হয়ে যাবেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

ঝড় থেমে গেছে আজ প্রায় এক বছর হলো , দুর্গত এলাকার চিত্র প্রায় একই রকম রয়ে গেছে। তীব্রতার দিক থেকে আইলা ঝড়টি সিডরের মতো শক্তিশালী ছিল না। তবু আইলার দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি আর ভয়াবহতা বিচার করলে এটিকে ইতিহাসের ভয়াবহতম দুর্যোগ হিসেবে অভিহিত করা যায়। এই ঝড়ে প্রায় শতাধিক ভাগ্যবান (?) মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। বেঁচে থাকা হতভাগ্য মানুষদের চিত্র তুলে ধরা যায় এভাবে :

৭০ হাজার প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষি গত আমন মৌসুমে কোনও ফসল ফলাতে পারেনি, এই বোরো মৌসুমেও পারবে না। আড়াই লাখ মানুষের কোনও কাজ নেই। ইতোমধ্যে উদ্বাস্তু হয়ে

আইলাদুর্গত এলাকা। ভাঙ্গা বাঁধের কারণে অঞ্চলটি বছর জুড়েই জলমগ্ন থাকে। চোখের পানিও তাই শুকায় না। ওরা পানিতে ভাসে, ওরা অশ্রুতেও ভাসে।

Aila came and went. But the destruction remains. And just like the ebbing tides flowing in and out through the broken embankments, so do tears of the thousands.

PHOTO: ABIR ABDULLAH

অভিবাসনে বাধ্য হয়েছে প্রায় এক লক্ষ মানুষ যার ১৫ হাজার খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন বস্তিতে বাস করছে। দুর্গত এলাকাগুলো থেকে স্বাদু পানির মাছ, গরু-ছাগল ও হাঁসমুরগি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়েছে। গাছপালা মরে উপদ্রুত এলাকাগুলো বিরাণভূমিতে পরিণত হয়েছে। এরই মধ্যে শুষ্ক মৌসুম চলে আসায় পানিতে লবণাক্ততা বেড়েছে এবং পানীয় জলের তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে। পানিতে ডুবে থাকা বিপন্ন মানুষগুলোকে কামড়ে ধরছে তীব্র শীত। শীতের কারণে মৃত্যু ঘটলেও কোনও কোনও গ্রামে কবর দেবার জায়গাটুকুও নেই।

(*সূত্র : হিউম্যানিটি ওয়াচ, সিএসআরএল কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য*)

শ্যামনগরের গাবুরা ইউনিয়নের পাশেই খলপেটুয়া নদী। এই খলপেটুয়া নদীর কতখানি পানি সাগর থেকে এসেছে আর কতখানি পানি এসেছে এই এলাকার মানুষের চোখের পানি থেকে–সেটা পরিমাপ করে দেখার সময় এসেছে। একটি দুর্যোগ ঘটে যাবে, এক বছরেও সেটির কোনও সুরাহা হবে না–এই অনাচার বন্ধ করতে হবে। যারা এজন্যে দায়ী তাদের কঠোরভাবে জবাবদিহি করতে হবে, প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিবেশ কিংবা সন্ত্রাস দমনের মতো দুর্যোগব্যবস্থাপনা নিয়ে একটি পৃথক আইন করা এজন্য এখন সময়ের দাবি। মিডিয়াকে আরও সচেতন হতে হবে। ঢাকার বাইরেও যে একটি বাংলাদেশ আছে, রাজনীতির বাইরেও যে খবর আছে, সুশীল সমাজ এবং সংবাদকর্মীদের সে কথা মাথায় রাখতে হবে।

বাংলাদেশের ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আমাদের একবার নতুন করে সবকিছু ভাবতে হবে। একখণ্ড মানচিত্রই আমাদের বলে দেবে, খুলনা সাতক্ষীরার এই এলাকাগুলো বাংলাদেশেরই অংশ, এই এলাকার মানুষগুলো বাংলাদেশেরই মানুষ। কাজেই আমাদের চোখ বন্ধ করে রাখার কোনও সুযোগ নেই। ওদের ওপর এক বছর ধরে যে অন্যায়, যে অবিচার চলছে, সেটির দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। এটা কোনও দয়া নয়, এটা সকলের দায়িত্ব। সরকার, প্রশাসন, উন্নয়ন সংস্থা, মিডিয়াকর্মী, সুশীল সমাজ সকলের উচিত তাদের কাছে যাওয়া। গিয়ে বলা, এতদিন আমরা বুঝিনি, আমাদের ভুল হয়েছে, সেই ভুলের জন্য আমরা ক্ষমা চাচ্ছি। বাংলাভাষার একজন লেখক হিসেবে এই ঘটনাটি নিয়ে এক বছর পরে লিখছি–এজন্যে আমি আইলাদুর্গত মানুষের কাছে কাগজে-কলমে ক্ষমা চাইছি।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হিমালয়ের চূড়া গলছে, মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে, কেবল আমাদের হৃদয় গলছে না। এই লজ্জা যেন আমাদের আর বেশি দিন বয়ে বেড়াতে না হয়।

আশীফ এন্তাজ রবি, সিনিয়র সহ সম্পাদক
দৈনিক যুগান্তর
১৪/০৫/২০১০

Victims of a broken promise

NICOLAS HAQUE

Nestled at the edge of the Sunderbany forest, Gabura Island is where human meets nature. On my first two visits before the cyclone Aila, I had seen how the rising sea level was affecting the villagers as they were losing land to the hungry tide and to unscrupulous shrimp farmers.

The brackish water used for farming shrimp had over time rendered the land barren. The villagers were on the move in search of fertile land. But as man continued to experiment with its environment, Mother Nature sent an unexpected message.

রিলিফের নৌকার দিকে ধেয়ে আসা মানুষ। প্রয়োজন তীব্র, তাই পানি ভেঙে হেঁটে আসা।

Victims of a broken promise: People walking through the river at Padmapukur in Satkhira to receive relief materials as roads went under water in June, 2009

PHOTO: ANISUR RAHMAN

On the 25th of May, 2009 Cyclone Aila struck the region, leaving 200000 people homeless, and scores of people dead. This was to be a harsh reminder of how powerless man is in the face of nature.

Natural disasters are not uncommon in the region. After all, there are countless non government organizations (NGO's) in the country, armed with foreign aid and development workers who live in the wealthy suburbs of Dhaka and are paid to help villagers 'Build Capacity'.

One would of thought that one-year on; the situation would have changed for the better. The homeless would have found a home and the hungry some food. But as I walk through Gabura Island, I see the same broken embankments, the same villagers living in makeshift tents, the same dire need for food and drinkable water. And I feel the sense that a promise has been broken.

Nicolas Haque, Correspondent
Al Jazeera English
13/05/2010

আলোছায়ায় আইলা বিধ্বস্ত মুখ

পাভেল রহমান

বিকেলের শেষ আলোতে ছুটছি। আইলার আঘাতে বিধ্বস্ত সাতক্ষীরার উপদ্রুত এলাকার আশাশুনিতে। ঢাকা থেকে খুলনা হয়ে আশাশুনি। পথে খুলনার সাংবাদিক কামরুল ইসলাম আমার সঙ্গী। পথপ্রদর্শক কামরুল আমাকে এগিয়ে নেয় আশাশুনির দুর্গতদের ঠিকানায়। পড়ন্ত বিকেলে উপদ্রুত এলাকার অন্তত দুটি ছবি হলেও চাই দিল্লির। আইলার ছবি বলে কথা! সারা বিশ্বের জন্যে অন্তত দুটি ছবি চাই।

আমার শুধু এই বিকেলের কিছু আলো চাই। অল্প কিছু আলো। ঝড়ের আগে ঝড়ের দিকে ছোটার অভ্যাস আমার আছে। কিন্তু এই আইলায় কোথায় যেন একটা অব্যবস্থাপনা হয়েছে। ঢাকা থেকে রওনা হতেই আমি দেরি করে ফেলেছি।

সঙ্গী কামরুল খুলনা ছাড়ার পর থেকেই 'আশাশুনি খুব কাছে' এমনই বলছিল বারবার। কিন্তু ওর বলার সঙ্গে গাড়ির দৌড়ের একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভাঙাচোরা রাস্তা। চিংড়ি ঘেরের পাশ দিয়ে পথটা আঁকাবাঁকা। ইচ্ছে থাকলেও গাড়ির গতি বাড়ানোর সুযোগ নেই। দ্রুত বয়ে যাওয়া সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেলাম আশাশুনিতে। হাইস্কুলের মাঠেই আটকে গেল চোখ। শত মানুষের মাঝে রিলিফের চাল বিতরণ চলছে। ত্রাণের এই লাইনটিই হয়ে যায় আমার ছবি। একের পর এক ছবি তুলে যাই আমি। দুর্গত বেদনাহত মুখগুলো থরে থরে সাজানো। হাতের মুঠোয় ধরা চালের ব্যাগ। একই স্থানে সময়ক্ষেপণের কোনও সুযোগ নেই। ছুটতে হয় অন্যদিকে আরও ছবির জন্যে।

চিংড়ি ঘেরের পাশ দিয়ে চলে যায় পিচঢালা পথ। সন্ধ্যার আকাশে তখন অন্ধকারের ছায়া। মানুষের মুখগুলোতেও নামে আঁধার। ছোট্ট কিশোর পানি ভরা কলসি নিয়ে রিকশা-ভ্যানের প্যাডেল চালায় প্রাণপণ। পেছন থেকে ভ্যান ঠেলে সাহায্য করছে তার মা। এই আমার আলো-ছায়ার আরেকটি সেলুলয়েড ছবি।

আইলায় জমে থাকা নোনাপানির আ'লে পায়ে পা রেখে ঘরে ফেরে দুর্গত মানুষ। সেটিও তো হয়ে যায় ছবি। চারদিকে তখন নেমেছে গাঢ় অন্ধকার। দ্রুত ফিরে আসি হোটেলে। ল্যাপটপের ছবি অ্যাসোসিয়েট প্রেসের দিল্লি অফিস হয়ে ছড়িয়ে যায় সারা বিশ্বে।

রাতেই আগামী দিনের পরিকল্পনাটা সেরে ফেললাম। ভোরেই ছুটব শ্যামনগর। আইলায় বিধ্বস্ত এলাকাগুলোর অন্যতম শ্যামনগর। কয়েক বোতল পানি আর কিছু বিস্কুট সঙ্গে নিয়ে কাকডাকা ভোরেই বেরিয়ে পড়লাম। ভোরের আলোয় পথচলায় একটা আলাদা আনন্দ আছে। এক্ষেত্রে মেঠোপথ হলে তো কথাই নেই। কিন্তু পথ চলতে চলতে আনন্দটুকু ফিকে হয়ে গেল। শ্যামনগরের পথে পথে তখন নিরাপদ পানির জন্যে মানুষের হাহাকার। মাইলের পর মাইল ধ্বংস হয়েছে বাড়ি। গ্রামের মানুষগুলো নিজ গ্রামেই পরবাসী। কোথায় থাকবে, কোথায় ঘুমাবে, কী খাবে, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। তার ওপর আবার পানির অভাব। পানির বোতলের দিকে তাকিয়ে থাকে তৃষ্ণার্ত মানুষ। সারাদিন পথচলায় এই পানিটা তো আমারও প্রয়োজন।

সরু পথটায় মানুষের হাতে শুধু কলসি আর কলসি। রাতভর এই কলসি নিয়ে পথে বসেছিল পানির আশায়। সাত সকালে কলসি হাতে গ্রামবাসীর ছবিগুলো হয়ে ওঠে আমার কষ্টের ছবি। শ্যামনগর স্কুল মাঠে আবার দেখি, রিলিফের জন্যে মানুষের উপচে পড়া ভিড়। গাছের তলায় রান্না হচ্ছে খিচুড়ি। পাশেই ছোট একটি ঘরে বসেছে মেডিক্যাল টিম। শ'খানেক মহিলা রোগী পেটের পীড়ার ওষুধ আর স্যালাইনের জন্যে কাদার মধ্যে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে। রোদ উঠেছে প্রচণ্ড। মাথার কালো চুল আর কালো ক্যামেরা– দুটোই যেন তাপ শুষে নিচ্ছে। শ্যামনগর থেকে পদ্মপুকুরের দিকটায় একটি নদী পার হওয়া দরকার। কিন্তু মুশকিল হলো নৌকায় ওঠার পাটাতনটা ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল। সেটি এখনও ঠিক করা হয়নি। এ কারণে শিশু আর নারীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ঘণ্টা দুয়েক প্রতীক্ষার পর পদ্মপুকুরের দিকে যাওয়ার জন্যে জোয়ারের পানিতে ভাসলাম।

পদ্মপুকুর যেন ছিন্নভিন্ন। বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি ঘর। আইলায় বাড়ি-ঘর হারিয়ে বাঁধে উঠে এসেছে গ্রামবাসী। আমাকে তারা রিলিফের লোকই মনে করল। রহিমুদ্দিন শেখ তাঁর ছোট্ট ঘরটি কোনও রকমে দাঁড় করিয়েছেন। আমার ক্যামেরায় আড়চোখে তাকান রহিমুদ্দিন শেখ। মুহূর্তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। তারপর হু হু করে কান্না। পরিবার নিয়ে ক'দিন ধরে অনাহারে আছেন। তাঁর কথা শুনে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। মানুষের এই বিপদে আমার কি কিছুই করার নেই? অসহায় এই মানুষগুলোর জন্যে মন খারাপ হয়ে আসে। ঝড়, বন্যা আর জলোচ্ছ্বাসে অসহায় মানুষগুলো বারবার দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু গোলপাতা, বাঁশ ও পাতা দিয়ে তৈরি ঘরগুলো বারবারই মুখ থুবড়ে পড়ে। নীলডুমুর, গাবুরা, দাকোপ, প্রতাপনগর, কলারোয়া, শ্যামনগর- সবখানেই আইলার আঘাতে মানুষের এই অসহায় অবস্থা।

আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল নিয়ে পরিকল্পনা করার এখন সময় এসেছে। যে পরিকল্পনায় অসহায় মানুষগুলোর জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা থাকবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে আমরা যাতে অসহায় না হয়ে পড়ি সে ব্যবস্থা থাকবে।

পাভেল রহমান, ফটোসাংবাদিক
এসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)
০৭/০৫/২০১০

The poor ye shall always have with you

TANIM AHMED

I had been waiting for some time in strong breeze for a boat. The breeze would have been pleasant at any other place or even under a shade. But the scorching midday sun of late March was a little too much for me to enjoy the breeze. I had been waiting for at least half an hour. The large country boat would take me across the river Kholpetua to Gabura. where I was hoping to find my story. Actually I had been waiting for two days without any luck.

I went to Shyamnagar, a sub-district of Shatkhira to visit Gabura union, one of the worst affected by Cyclone Aila to investigate the state of the affected people ten months after the Cyclone. People had told me about the miseries of Gabura's inhabitants. They told me about their dire plight about living on the stretches of embankment that remained firm, how their livelihoods were robbed by the cruel nexus of nature and corruption.

Those unfortunate people also told me how they were reduced to living on relief assistance. And for some of those who could go back to their homesteads, it became foolhardy to do so. Evidently they seem to have fallen victim to 'moral hazard'. They were told 'stay in your makeshift shanty on the embankment and you will get assistance. Go home and you will have been considered rehabilitated and relief would stop almost at once.' Not many were willing to risk that in a land where sweet water for drink is hard to find.

Sure it was bad. Perhaps a little worse than most villages affected. Perhaps a little better than other villages Í remotely tucked away in the idyllic white shoals of Kurigram or the lush green hills of Khagrachhari Í that have not caught the eye of international NGOs. But there was nothing that jumped right up at your face. Nothing that stood out at first glance.

So there I was, waiting for the story. Still sitting on one side of the boat, waiting for it to fill up. People piled on in their sleepy pace that Bangldeshi villagers seem to be genetically infected with. Some had come from as far as Shatkhira, some were on their daily commute.

I suddenly discovered that two small children implanted themselves, completely unnoticed, between a perpetually frowning man and me. He had located them before me and was already appraising the two with a thorough disapproval as the younger of the two, a muddy little boy of about five, kept sweating and soiled his white shirt.

I wondered why the little boy was dripping as if he had just run a few miles. His sister was wiping away the beads of sweat pouring down his face with the free end of her 'orna'. With the other end she covered a pitcher full of muddy water. There were two large plastic bottles of mineral water also full of the same muddy water lying by the boy's feet. They were tied to the ends of an improvised pole that used to be a stout branch not very long ago. Reema and Jainul were carrying water

ঘরবাড়ির সাথে খেলার মাঠটিও তলিয়ে গেছে অথৈ পানির নীচে। দুরন্ত শৈশবের তাই ছুটে বেড়ানোর সুযোগ নেই, আছে কোনক্রমে ভেসে থাকা কিংবা যেকোনও সময় ডুবে যাবার সংশয়

The gushing waters conquer all, homesteads and playgrounds alike, like a cruel demon. But childish innocence is pure at heart and defies even the demon.

PHOTO: MONEERUL ISLAM

home across the river. I was elated. I had found my story.

The children seemed to want to squeeze in even tighter between two adults desperately trying to melt into the crowd. They were actually trying to avoid the eyes of the boatmen who would charge them Tk 2 each for crossing the river. Jainul bubbled with the typical energy of a five year old and was excited at the prospect of buying candies with the money that his mother had given Reema after several days of nagging. Reema would buy them at a shop near the landing station at Gabura.

She tried to hush up Jainul several times as he kept answering my questions. Reema, however, had strong reservations about the strange man asking questions that were none of his business. She eyed the stranger with a wholehearted suspicion that politely well-spoken men with pens and notebooks rightly deserve.

But I was determined to brave Reema's contempt and follow her all the way home. It was a fairly long walk. As she walked down the shanty-lined earthen walkway of the embankment with a pitcher on her waist, Jainul failed to keep up with his bottles. His little feet simply would not listen. And when the stranger from Dhaka insisted to carry his load, Jainul hardly put up a resistance. This of course earned me enough brownie points and out of Reema's earshot Jainul talked his heart out.

They had been back in their old house near the edge of 9th Shora village Í admittedly a strange name Í for a few months now. We went off the embankment into the barren interior of Gabura. I followed them down the path having a hard time keeping up with Reema, balancing the pole on my shoulder and crossing the many streams that flowed in from the river. The barren land was plain

and almost entirely without vegetation as these generally housed large shrimp ponds. Jainul skipped along beside me. I kept wishing that the trek would be a long one as I felt my shirt getting stickier on my back with sweat. Then I could come back and write how even a grown-up had a hard time doing a chore that mere children were charged with.

So when after just about half an hour of brisk walking Jainul pointed to a cluster of huts delightfully proclaiming them to be his home, my dismay knew no bounds. It was hardly 3 kilometres from the landing station. Another half hour and I could have drunk the entire pitcher. Would have made great copy, I kept thinking to myself.

The villagers were all excited. Convinced that now, at long last, something good would come their way, namely a tube well. I was the first person to come see them in the three months that people had settled there, they told me, giving due credit to Reema. æYou lured this man all the way from across the river, did you? You wicked you!"

Reema partly glowed at her singular achievement, and partly blushed at the innuendo.

I took leave soon after asking the routine questions and collecting the routine quotes. Lines played out through my head as I finally headed for the ferryboat after going through a few more villages. The perennial question was already nagging Í where to start the story, how best to portray their misery.

Over the next two days I spoke to NGO workers and local politicians. I spoke to government officials and contractors repairing the damaged embankments. They were very busy with a meeting here, a discussion there--three tube-wells in that village, one pond sand filter in this one; candies for the children, supplies for the embankment.

The discussions were almost necessarily pregnant with urgency, stressing the need for resources. Then of course they had to make sure that everything fit into the framework. One could not just be a cowboy and give a go-ahead to something without prior approval no matter how strong the need. They too spoke of the misery of the people.

A couple of weeks later I received a phone call from 9th Shora village. They had gotten a tube-well and now people did not have to spend hours to fetch water. They were happy. And it struck me. I had seen my despair of 'not finding a story' reflected on other faces too.

I remembered the heated discussions over the misery of the people and each expounding on their own perception of the pervading problems and impressing upon others the uniqueness of their standpoint and their proposition to solve the matter once and for all. Not too different from vultures fighting over a carcass. I remembered the mocking poem by Ross Coggins. The last lines read:

"Enough of these verses – on with the mission!
Our task is as broad as the human condition!
Just pray god the biblical promise is true:
The poor ye shall always have with you."

Tanim Ahmed, Assistant Editor
bdnews24.com
10/05/2010

রিক্ত মানুষের শুন্য দৃষ্টি
Empty look of a helpless person
PHOTO: ABIR ABDULLAH

নোনা রুখতে বাঁধ, নোনা বাড়াতেও বাঁধ

গৌরাঙ্গ নন্দী

আইলা আঘাত হানার পরদিন ২৬ মে ২০০৯ আমি খুলনার দাকোপে যাই। পৌঁছুই কামারখোলা ইউনিয়নের এক কোণে। আমার চেনা কামারখোলা ইউনিয়নের সঙ্গে সেদিনের ওই অংশটুকু ছিল একেবারেই অপরিচিত। আক্ষরিক অর্থে স্থানটি ছিল একটি ধ্বংসস্তূপ। সেদিন বিবিসির সাড়ে সাতটার সংবাদে আমার বয়ানে প্রচারিত হয় সেই পরিস্থিতি। আসলে ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা আমি সামান্যই তুলে ধরতে পেরেছিলাম। দুর্গত মানুষদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠা দুর্দশার ভয়াল চিহ্ন আমার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছিল। পরিস্থিতি বর্ণনার জন্যে আমি শব্দ হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি যুৎসই শব্দ খুঁজে পাইনি।

পরদিন যাই কয়রা উপজেলার সদর ইউনিয়নে। পায়ের পাতা ভেজা পানি জোয়ারে ফুলে-ফেঁপে ঘণ্টা দুয়েকের ব্যবধানে কোমর-বুক ছাড়িয়ে যায়। ঝাঁপিয়ে শুকনো জায়গায় ফিরি আমি। অন্য মানুষেরাও এক টুকরো শুকনো ভূমির সন্ধানে যে যেখানে পারেন ছুটছিলেন। আইলার গ্রাস থেকে বাঁচানো গৃহস্থালির সামান্য সম্পদ নিয়ে নিরাপদ জায়গার আশায় ঘুরছিলেন তাঁরা।

ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতের এক বছর পরও দুর্গত মানুষদের দুর্দশা খুব বেশি একটা ঘোচেনি। দাকোপ-কয়রার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এখনও রাস্তার খুপড়িতে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। কবে তাঁরা বাড়ি ফিরতে পারবেন বা আদৌ পারবেন কি-না, এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই তাঁদের।

মানুষের মৃত্যু সংখ্যা দিয়ে কোনও দুর্যোগের ভয়াবহতা বোঝানো হয় বলে ঘূর্ণিঝড় সিডরের (১৫ নভেম্বর ২০০৭) চেয়ে আইলা শুরুর দিকে গণমাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব পায়। কম সংখ্যক মৃত্যু দুর্যোগ মোকাবেলার সাফল্য হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় (হয়তো এই দাবি সঠিক), তবে এই সাফল্যের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় কোনও দুর্যোগের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া সফলভাবে মোকাবেলা করে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের যথাযথ পুনর্বাসন করতে না পারার অক্ষমতা বা ব্যর্থতাটি।

সাংবাদিক হিসেবে আমার হতাশার দিকটি হলো, ঢাকা থেকে অনেক দূরে খুলনা শহরে অবস্থান ও কাজ করা একজন প্রান্তিক সংবাদকর্মী হিসেবে আমি কেন্দ্রের (ঢাকার) সাংবাদিকদের আইলার ভয়াবহতা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার লিখে একাধিক জনের কাছে শুনেছি, 'আপনার এলাকায় বিষয় কি আর নেই?' শুধু গণমাধ্যম নয়, সরকারও বিষয়টি প্রথম দিকে উপেক্ষা করেছে। সহায়তার জন্যে দাতা সংগঠনগুলোকে সরকার প্রথমে আনুষ্ঠানিক আহ্বান করেনি। দাতা সংস্থাগুলোও দুর্যোগটিকে ঠিক অনুধাবন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

আইলার প্রভাব কেন এত সুদূরপ্রসারী এবং কেনই বা এক বছরেও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ঘরে ফিরতে পারল না? এর প্রধান কারণ -আইলার প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) বেড়িবাঁধ ভেঙে এবং বাঁধ উপচে নদীর নোনাপানিতে লোকালয়, বসতি, ধানক্ষেত, পুকুর, ঘর-বাড়ি সব ভেসে যায়; তলিয়ে যায় গোটা এলাকা। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ তখন বলেছিল, ত্রাণের জন্যে যে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, তার বিনিময়ে তাঁরা বাঁধ বাঁধবে; বেঁধেছেও। স্বল্প ভাঙনের জায়গায় স্থানীয় মানুষদের এই চেষ্টা সফল হলেও অধিক ভাঙনের জায়গায় বাঁধ মেরামত করা যায়নি। বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে দিনে দু'বার জোয়ারের পানি ঢুকে লোকালয় প্লাবিত করে। ভাটার সময় পানি সামান্য কমলেও নোনাপানির জলাবদ্ধ দশা কাটে না। দিনে দিনে বাঁধের ভাঙা অংশ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় বেড়েছে। এক বছর ধরে চলা এই দুরবস্থার কারণে দাকোপ, কয়রা এবং সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরের লক্ষাধিক মানুষ এখনও রাস্তার ওপর খুপড়িতে বাস করছেন। তাঁরা আর ফিরতে পারেননি নিজেদের ভিটেয়।

ঘূর্ণিঝড় আইলার সঙ্গে ধেয়ে আসা জলোচ্ছ্বাসে খুলনা ও সাতক্ষীরার চারটি উপজেলার ৬০০ কিলোমিটারেরও বেশি বেড়িবাঁধ ধসে যায়। ফলে এলাকাগুলোর জীবনযাত্রা, অবকাঠামো, পরিবেশ-প্রতিবেশ–সবকিছুই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। নিচে এর একটি চিত্র তুলে ধরা হলো–

- প্রায় ২ লাখ একর কৃষিজমি নোনাপানিতে তলিয়ে যায়, কাজ হারায় ৭৩ হাজার ক্ষুদ্র কৃষক ও কৃষি-মজুর;
- এলাকার পানীয় জলের উৎস পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়, খাদ্যের চেয়ে মানুষ পানির জন্যে কষ্ট পাচ্ছে বেশি;
- নোনাপানি ঢুকে কয়েক হাজার পুকুরের (১,০৭৪ একর) স্বাদু পানির মাছ মরে যায়;
- প্লাবন ও নোনাপানির প্রভাবে কমপক্ষে ৫০০ গরু ও দেড় হাজার ছাগল মারা যায়, পানির দরে বিক্রি হয়

অনেক মানুষ বাস্তুহারা–এদের আশ্রয় এরকম সংকীর্ণ বাঁধের অস্থায়ী ডেরায়–বাপ-দাদার ভিটের মায়া পেছনে ফেলে জীবনের অমোঘ প্রয়োজনে বাকিরা চলে গেছে দূরে কোথাও।

Refusing to leave their homesteads, hoping to return someday and begin afresh, thousands live like refugees in shanties.

PHOTO: MONEERUL ISLAM

কয়েক হাজার গবাদিপশু;

- কয়েক মাস পর এলাকাগুলোর গাছপালা মরতে শুরু করে এবং বিরাণভূমিতে পরিণত হয় (অবশ্য গাছপালা আগে থেকেই ওই এলাকায় কম ছিল);
- এলাকাগুলোর কমপক্ষে ৩ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়, যার কমপক্ষে ১ লাখ বিভিন্ন শহরে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়ে যায়;
- পর পর দুটি মৌসুম কৃষিকাজ না হওয়ায় প্রায় ৮ লাখ টন খাদ্যঘাটতি সৃষ্টি হয়।

এরকম অবস্থায় মানুষ স্বেচ্ছাশ্রম বা কাজের বিনিময়ে খাদ্যের বিনিময়ে বেড়িবাঁধ নির্মাণ শুরু করে। কিন্তু বর্ষা এসে পড়ায় পানির প্রবল চাপে মেরামত করা বাঁধগুলো আবারও ভেসে যায়। মানুষ তাকিয়ে ছিল, সরকার তথা পাউবোর দিকে। কিন্তু পাউবো নির্লিপ্তভাবে শুষ্ক মৌসুমের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। অবশ্য জুলাই ২০০৯-এ পাউবো রিং বেড়িবাঁধ দেওয়ার একটি পরিকল্পনা করলেও তার বাস্তবায়ন হয়নি। ভাঙন আরো বিস্তৃত হয়, মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়ে। সরকারের নীতি-নির্ধারক মহল বিব্রত হন। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী সরকারের এক বছর পূর্তিতে সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, সরকার এই একটি ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

বেড়িবাঁধই কি এই অঞ্চলের সকল কিছুর নিয়ন্তা?- এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যটির দিকে তাকাতে হবে। উনিশশ' ষাটের দশকে উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণের (কোস্টাল ইমব্যাঙ্কমেন্ট প্রজেক্ট–সিইপি) পর পরবর্তী দুই দশক ভালো ফলন হলেও এটি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিবেশের জন্যে একটি হুমকি বয়ে আনে। এ অঞ্চলের নদ-নদী দিয়ে বয়ে যাওয়া ৩০ মিলিয়ন টন পলি নদী-খাল-নালা বেয়ে কৃষিজমিতে যেতে না পেরে নদীর তলদেশে জমা হতে থাকে। এক পর্যায়ে বাঁধের বাইরের নদীর অংশ জমির চেয়ে উঁচু হয়ে যায়। কৃষিজমি পরিণত হয় জলাধারে। দেখা দেয় দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতা। যশোর থেকে শুরু হয়ে ক্রমেই দক্ষিণের খুলনা ও সাতক্ষীরার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে প্রতিবছর।

আবার উনিশশ' আশির দশকের শুরুতে আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর ঋণ সহায়তা দিয়ে উৎসাহিত করা হয় চিংড়ি চাষ। বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যুক্তি দিয়ে এ অঞ্চলের কৃষিজমিকে পরিণত করা হয় নোনা জলাধারে। কিন্তু এর অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া কখনোই বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। বাঁধ কেটে অন্যের জমিতে জোর করে নদীর নোনাপানি প্রবেশ করিয়ে দিলেই হলো। যতো পরিমাণ জমি নোনাপানিতে তলিয়ে গেল, ততো জমির চিংড়ি ঘের সেই দখলদারের। এছাড়া খাসজমি দখল থেকে শুরু করে অপহরণ-খুন-গুম-ধর্ষণ-লুটতরাজ-অগ্নিসংযোগ সকল কিছু সংঘটিত হয়েছে চিংড়িকে কেন্দ্র করে। এর প্রতিক্রিয়ায় সমাজের প্রচলিত বন্ধন, সমাজকাঠামো ভেঙে পড়ে, সন্ত্রাস বেড়ে যায় এবং সাধারণ মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকে। পরিহাসের বিষয় হলো, কৃষিজমিতে নোনাপানি প্রবেশ রোধের জন্যে যে বাঁধ দেওয়া হলো, সেই বাঁধ এখন নোনাপানি আটকে রাখার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর নোনার হাত থেকে রক্ষা পেতে যে বাঁধ ব্যবস্থা তৈরি হলো, সেই বাঁধ কেটে নোনাপানি আটকে চিংড়ি চাষের কারণে গোটা এলাকার মাটি ও পানিতে লবণাক্ততা ভয়ঙ্কর মাত্রায় বেড়ে গিয়েছে।

চিংড়ি চাষের উদ্যোগ-আয়োজন ব্যক্তি উদ্যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। রাষ্ট্র তথা সরকারের তৃতীয় ও চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের আওতায় চিংড়ি চাষকে উৎসাহিত ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে পানি ব্যবস্থাপনার নামে বাঁধের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব আরোপ করা হয়। বাঁধে নতুন করে স্লুইচ গেট তৈরি করা হয়। আর পানি ব্যবস্থাপনার নামে একটি তথাকথিত 'জনগণের কমিটি' গড়ে তোলা হয়। যার নেতৃত্বে আবির্ভূত হন চিংড়ি চাষের সঙ্গে যুক্ত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মানুষেরা। এই মানুষেরাই বছরের পর বছর ধরে গোটা এলাকার স্লুইচ গেট তথা নোনা পানি ওঠানো-নামানোর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে থাকে। যেখানে সাধারণ মানুষ, অল্প বা সামান্য

জমির মালিকের কোনও কথা শোনা হয় না; আর পাউবো'র লোকেরা তাদের আজ্ঞাবহ অনুচরের মত এবং পুলিশ তাঁদের পরামর্শ নিয়ে চলে। বাঁধ ইচ্ছেমত কাঁটা-ছেড়া তাঁদের অধিকার (!), কারণ তাঁরা দেশে বিদেশী মুদ্রা (ডলার) আনে।

আইলায় বেড়িবাঁধ ভেঙে পড়ার পেছনে যেসব কারণ কাজ করেছে তার প্রায় সবগুলোই চিংড়ি চাষ সম্পর্কিত। বাঁধের ভেতর দিয়ে নির্বিচারে পাইপ ও অবৈধ স্লুইচ গেট নির্মাণ এবং বাঁধ কেটে নোনাপানি ঢোকানোর কারণে আগে থেকেই বেঁড়িবাধগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। ভেতর দিকে অতিরিক্ত লবণাক্ততার প্রভাবে মাটির স্বাভাবিক শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। আর বাঁধ রক্ষার জন্যে বাঁধের বাইরে (নদীর পাড়ে) যে ভূমি ছিল, দীর্ঘদিনের পাইপ বসানো, বাঁধ কাটা, ইচ্ছেমতো স্লুইচ গেট বসানো- এসব কারণে ওই ভূমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ফলে এখন সরাসরি বাঁধের ওপর নদীর পানির চাপ পড়ে।

আইলায় বিধ্বস্ত হওয়ার আগেই ১৪ ফুট চওড়া বাঁধগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে চওড়ায় ৬ থেকে ৮ ফুট ও উচ্চতায় গ্রামের সাধারণ রাস্তার রূপ নেয়। এ কারণে এই বেড়িবাঁধগুলো ভরা জোয়ারের চাপ সহ্য করার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলে। এর প্রমাণ ২০০৭ ও ২০০৮ সালে শ্যামনগরের গাবুরা ও কয়রার দক্ষিণ বেদকাশীর বাঁধগুলোয় ভাঙন। এছাড়া ২৫ মে আইলা আঘাত হানার আগের দিন কয়রার মদিনাবাদ এলাকায় বাঁধ ভেঙে যায়। আর উত্তর ও দক্ষিণ বেদকাশী এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে আগে থেকেই নোনাপানি থৈ থৈ করছিল।

১৯৫২ সালের 'এমব্যাংকমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট' অনুযায়ী বেড়িবাঁধ নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কারের দায়িত্ব পাউবোর। কর্মী স্বল্পতা, ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার সঙ্গে স্থানীয় সরকার, প্রশাসন ও কৃষিভিত্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের অভাবে বেড়িবাঁধগুলোর ব্যবস্থাপনা প্রকারান্তরে প্রভাবশালী চিংড়ি ঘের মালিকদের হাতে চলে গিয়েছে। আর মামলা করেই পাউবো তার দায়িত্ব শেষ করে। অবশ্য, করারও কিছু নেই। কারণ তখন বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিষয়। পুলিশ অবৈধ বাঁধ কাটা, ফুটো করা অথবা বাঁধের ক্ষতিসাধনের জন্যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারে না; কারণ তারা প্রভাবশালী। আর এই অপরাধের শাস্তি মাত্র কয়েকশ' টাকা। এ কারণে কেউ বাঁধের ক্ষতি করাকে কোনও গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচনা করে না।

আইলার আঘাতে দাকোপের দুই ইউনিয়নের ১৮ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ সম্পূর্ণ এবং ২০ কিলোমিটার বাঁধ আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজের বিনিময় খাদ্য এবং এনজিওদের ক্যাশ ফর ওয়ার্ক-এর মাধ্যমে কিছু রাস্তা মেরামতের কাজ হয়েছে। বাঁধ নির্মাণ প্রসঙ্গে পানি উন্নয়ন বোর্ডের খুলনা-২ অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী মোসাদ্দেক হোসেন বলেন, 'কামারখোলা ও সুতারখালীর সাতটি বড় ভাঙন এলাকার ক্লোজারগুলো মেরামতের জন্যে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০০৯ থেকে একাধিকবার টেন্ডার আহবান করা হয়।' শেষ পর্যন্ত পাউবো কার্যাদেশ দিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০ পর্যন্ত সময় নেয়ায় নদীতে জোয়ারের তীব্রতা বেড়ে যায়। বাঁধ বাঁধা কঠিন হয়ে পড়ে। একাধিক জায়গায় আবারও বাঁধ ভেঙে যায়।

দেখা গেছে, কম ঝুঁকিপূর্ণ ভাঙন এলাকার দরপত্রে ঠিকাদাররা অংশ নিলেও সবচেয়ে মারাত্মক এবং অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার দরপত্রে কেউ অংশ নেয়নি। কয়রা উপজেলার পবনা এলাকার মঠবাড়ির দুটি জায়গা, শিকারী বাড়ি, পাথরখালী এবং পদ্মপুকুর; দাকোপের নলিয়ান; শ্যামনগরের গাবুরা, পদ্মপুকুর এলাকায় বাঁধের ভাঙন ছিল মারাত্মক। এসব জায়গায় আগে রিং বাঁধ দিয়ে পরে ক্লোজার দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছিল; কিন্তু এই জায়গাগুলোর অধিকাংশ এলাকা এ বছরের মার্চ মাসের পূর্ণিমার জোয়ারে আবারও ধসে যায়।

পাউবো কোনও একটি কাজের জন্যে সর্বোচ্চ ছয়বার দরপত্র আহ্বান করতে পারে; তারপর যেকোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তাদের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার কম হওয়ায় এবং বাঁধ বাঁধতেই হবে, এমন সুযোগ কাজে লাগিয়ে ঠিকাদাররা অনীহা দেখিয়ে কাজটির জন্যে টাকা বাড়িয়ে দেয় বলেও কেউ কেউ অভিযোগ করেন। অবশ্য সরকারি ক্রয়বিধিতে (পাবলিক প্রকিওরমেন্ট রেগুলেশন) জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে বিশেষ বিবেচনায় কার্যাদেশ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে, পাউবো বিষয়টি সেইভাবে দেখতে পারত। কিন্তু পাউবো কর্তারা মানুষের দুর্ভোগ লাঘবের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হলো না।

অনেক ভুক্তভোগী মনে করেন, বাঁধ ভাঙা থাকলে নদীর নোনাপানি ওঠা-নামা করলে চিংড়িচাষীদের অনেক সুবিধা। কারণ, বর্তমানে বেশিরভাগ জমি-মালিকদের মধ্যে চিংড়ি চাষবিরোধী মনোভাব প্রবল, কম জমির মালিকরা তো নোনাপানির চিংড়ি চাষ চায় না। ধনী কৃষক, শহুরে টাকাওয়ালারা এখনো গ্রামের গরিব কৃষকের ঘাড় মটকে চিংড়ি চাষ করতে চায়। এ কারণে এলাকায় বাঁধ বাঁধা না হলে নোনাপানিতে অন্য কোনো ফসল হবে না– এই অজুহাতে তারা আবারও চিংড়ি চাষ করতে পারবে; (অবশ্য, বহু এলাকায় আবারও নোনাপানি তুলে চিংড়ি চাষ করার প্রবণতা দেখে এই অভিযোগ বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না)। বিস্ময়কর হচ্ছে, যে জনপ্রতিনিধিরা সংসদ নির্বাচনের আগে নোনাপানির চিংড়ি চাষ হবে বলে অঙ্গীকার করেছিলেন, সেই জনপ্রতিনিধিরা আবার চিংড়ি চাষে উৎসাহ দিচ্ছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে যিনিই চিংড়ি চাষী, তিনিই ঠিকাদার, আবার তিনিই জনপ্রতিনিধি; এর ফল হিসেবে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই দুর্ভোগের অবসান কবে হবে?- আপাতত তা বলার কোনও সুযোগ নেই।

দুর্যোগগ্রস্ত এলাকাটিকে সরকারিভাবে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করা হয়নি। দুর্যোগের শিকার মানুষগুলো দিনের পর দিন অমানবিক জীবন কাটাচ্ছে। আমাদের দেশে এমন কোনও আইন বা বিধিবিধান নেই যার মাধ্যমে দুর্যোগের শিকার মানুষগুলো কোনও প্রতিকার পেতে পারে। আমরা কি দুর্যোগের শিকার মানুষগুলোর অধিকার রক্ষায় কোনও আইন তৈরি করতে পারি না? আইনপ্রণেতারা কি বিষয়টি ভেবে দেখবেন?

গৌরাঙ্গ নন্দী, ব্যুরো চিফ, খুলনা
দৈনিক কালের কণ্ঠ; প্রদায়ক, বিবিসি বাংলা
০৬/০৫/২০১০

Gabura: Where Aila hits daily

MUKTADIR RASHID

When I visited Aila hit southwestern part in the country almost after a year of the cyclone, I found that crisis of drinking water, loss of livelihoods, health problems are a cruel reality for the people in villages of 9th shora and Kholpetua under Gabura Union of Satkhira District. After visiting those villages it appeared to me that in those villages Aila strikes everyday. Cyclone Aila hit the region on May 25, 2009. Though Aila was not so devastating like cyclone Sidr in terms of killing people but its impact was severe as it created serious socio-economic and environmental imbalance.

On May 13, 2010 I saw the people in Kholpetoa village needs to walk on average four kilometers or cross the same distance by small boats to collect drinking water, provided by some local and international NGOs. The locals said that an international NGO in cooperation with a local NGO were providing each family at least five liters water in three consecutive days, which was insufficient with the demands for the 595 households in the village. They alleged that the local lawmaker and peoples representatives were yet to address such severe problem. 'I do not find any change one year after of Aila hit the area,' Samiron Khatun said. I met with a madrasa student Tahera Khatun, 17, daughter of GM Abdur Rahim, a shrimp farmer and businessman. Tahera, who is a part of a seven-member family, told me that before the cyclone Aila hit her area, her father used to earn about Tk 30,000 monthly from shrimp fry farming and shrimp related business. 'Now, my father goes to River Kholpetua for catching shrimp fry and crab everyday as he has no option to earn except fishing,' Tahera said. Rahim's earning is now reduced to less than Tk 3,000 in a month. As a result the living standard of the business-man' family has been totally changed. Like Tahera's father, living standard of many people in those villages fell drastically since a large number of people have to live on embankments as homeless.

The government took several rehabilitation programs but most of the implementing agencies were idle, showing numbers of excuses derived from corruption. It would have been more appropriate if a high powered and independent agency could carry out the government orders in post disaster period. Or I wonder if a disaster management act empowering people's right could have saved thousands in this region.

Muktadir Rashid, Staff Correspondent

The Daily New Age

15/05/2010

ঝড় থেমেছে কান্না থামেনি

শামীম আল আমিন

ঝড় থেমে গেছে এক বছর আগে। মানুষের কান্না এখনও থামেনি। জোয়ার-ভাটার দোলাচলে এখনও দুলছে আইলার তাণ্ডবে বিধ্বস্ত জনপদের জীবন। এখনও ওইসব এলাকায় প্রতিদিনই বয়ে যায় দুঃসহ আইলা।

গত বছর ২৫ মে দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকার কয়েকটি জেলায় ঘূর্ণিঝড় আইলা আঘাত হানে। তখন সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) বাঁধগুলো। অনেক জায়গায় এখন আর বাঁধের অস্তিত্ব নেই। মাস দুয়েক আগে খুলনার দাকোপ উপজেলার কয়েকটি এলাকায় গিয়েছিলাম। ওইসব এলাকার পথে-ঘাটে আইলার ক্ষত এখনও রয়ে গেছে। ভেঙে যাওয়া বাঁধগুলো আজও নির্মাণ করা যায়নি। যে কারণে সাতক্ষীরা জেলার চার উপজেলার পাঁচ লাখ মানুষ এখনো পানিবন্দি। এখনো তারা গৃহহারা। পাউবোর ভাঙা বাঁধের ওপর বাস করছে তারা। রাস্তার জীবনের অভিশাপ থেকে বের হতে পারছে না। গ্রীষ্মের খরতাপে পুড়ছে, কালবৈশাখির তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হচ্ছে এসব মানুষ।

স্কুল নেই, কলেজ নেই। শিক্ষার বেহাল অবস্থা। বিনোদনের নেই কোনও সুযোগ। কাজের তেমন সুযোগ না থাকায় ঠিকমতো খাবারও জোটে না। সরকারের পক্ষ থেকে মাসে পরিবার প্রতি ২০ কেজি করে চাল দেওয়া হচ্ছে। এ সাহায্য যথেষ্ট নয়।

আইলাদুর্গত এসব মানুষের ভাগ্য এখনও পানিতেই তলিয়ে আছে। মাঝে মাঝে ভাটার টানে পানি সরে গেলে তাদের মনে আশা চিকচিক করে ওঠে। কিন্তু তা খুব স্থায়ী হয় না। জোয়ার এলে সেই আশাও তলিয়ে যায়।

খুলনা শহর থেকে দাকোপ উপজেলার কামারখোলা বাজার ৩৫ কিলোমিটার দূরে। এটুকু পথ যেতে সময় লেগে যায় তিন ঘণ্টারও বেশি। এই পথ আইলার আগে মসৃণ ছিল। দাকোপের মানুষের জীবনও এখন এই পথের মতোই দুর্গম। কেবল কামারখোলা নয়; গুনারি, কামিনীবাসি ও আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখা গেল, চারিদিকে কেবল পানি আর পানি। তারপরও পানির জন্যেই মানুষের হাহাকার। খাবার পানি নিয়ে সেখানকার মানুষের যে যুদ্ধ তা বিবেকহীনকেও চিন্তায় ফেলে দেবে। এমনিতেই উপকূলীয় এলাকার মানুষকে যুদ্ধ করতে হয় সাগরের নোনাপানির সঙ্গে। তার ওপর, আইলা আঘাত হানার পর তলিয়ে গেছে খাল-বিল-ডোবা আর পুকুর। টিউবওয়েলের পানিতেও এখন লবণ।

তৃষ্ণা মিটিয়ে পানি পান আর মিঠাপানিতে শরীর জুড়িয়ে গোসল করার স্বপ্ন আবার কবে এসব এলাকার মানুষের পূর্ণ হবে তা কেউ বলতে পারে না।

খাবার পানি জোগাড় করতে সেসব এলাকার মানুষকে উত্তাল শিবসা নদী পাড়ি দিতে হয়। তারপরও যে পানি মেলে তা খাওয়ার মতো নয়। যে কারণে রোগ-ব্যাধি লেগেই থাকে। ডায়রিয়া, কলেরা ও জলবসন্ত সেই এলাকায় এখনো নিয়মিত ব্যাপার। ধারে কাছে নেই চিকিৎসার সুযোগ।

ওই এলাকার বেশ কয়েকজনের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আপনারা সবার আগে কী চান? সবাই একবাক্যে বলেছেন, দু-এক বেলা না খেয়ে থাকতেও আপত্তি নেই। সবার আগে চাই বাঁধ নির্মাণ। এই বাঁধই পারে জীবন বাঁচাতে। ফিরিয়ে দিতে পারে তাদের প্রিয় আবাসভূমি।

আইলা আঘাত হানার এক বছর পরও কেন এই বাঁধগুলো নির্মাণ করা গেল না? এমন প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি পানি উন্নয়ন বোর্ড। স্থানীয় উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, প্রথম দিকটায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, পরে কাজ পাওয়া নিয়ে তৈরি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তাদের দুর্নীতি এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের লোভ-লালসার কারণের বাঁধের কাজ পিছিয়ে গেছে। এক পর্যায়ে যখন বাঁধের কাজ শুরু হয় তখন বর্ষাকাল। বাড়তে শুরু করেছে নদীর পানি। পরে অবশ্য শোনা গেছে, ওইসব এলাকায় বাঁধ নির্মাণে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ, ওইসব এলাকার মানুষের দুর্ভোগকে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে দেখতে হবে। সরকারের আলাদা নজর দিতে হবে। তথাকথিত দরপত্রের বাইরে গিয়ে বাঁধ নির্মাণ কাজ ঠিকভাবে করতে পারবে এমন দক্ষ প্রতিষ্ঠানের হাতে দায়িত্ব দিতে হবে। সেনাবাহিনীর সহযোগিতাও সেখানকার মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করতে পারে।

খাবার পানির স্থায়ী সমাধানের জন্য কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে, তা ভেবে দেখা দরকার। কয়েকটি এনজিও কিছু এলাকায় পুকুরের পানি খাবারের উপযোগী করে দিয়েছে। তবে তা যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে মাননীয় খাদ্য ও দুর্যোগ্য ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক চ্যানেল ওয়ানে নির্বাচিত খবর অনুষ্ঠানে আমাকে

কবে ফিরবে জীবনের স্বস্তি–উদাস দৃষ্টি নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুণেন আইলাদুর্গতরা

They hope against all odds and look into the horizon whence the sun rises and sets everyday. It seems almost as far away as their hope for a better life.

PHOTO: MUBASHAR HASAN

জানিয়েছিলেন, আইলাদুর্গত এলাকার মানুষের পানির সমস্যা সমাধানে স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন। বিশেষ করে জাপান সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় সমুদ্রের নোনাপানি শোধন করার প্লান্ট স্থাপন করার কথা তিনি জানিয়েছিলেন। উদ্যোগটি কেবল আইলাদুর্গত নয়, উপকূলীয় এলাকার মানুষের জীবনে ভীষণ স্বস্তি এনে দিতে পারে।

আইলা দুর্গত ওই এলাকায় চিকিৎসা সুবিধা সবার হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য সেখানে ছোট ছোট কমিউনিটি হাসপাতাল স্থাপন করা যেতে পারে। এনজিওগুলোর এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজ করার আছে। সরকারি খাদ্য সহায়তা বাড়াতে হবে। সদস্য সংখ্যার তুলনায় পরিবার প্রতি মাসে ২০ কেজি করে চাল যথেষ্ট নয়। এ দিকটিও ভেবে দেখা দরকার।

স্কুল-কলেজ-রাস্তা সংস্কারের কাজ দ্রুত করতে হবে। মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করতে হবে। কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সবার জীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে দিতে চোখে পড়ার মতো কাজ করতে হবে ওইসব এলাকায়। আইলা দুর্গত মানুষগুলোর সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা, ঘরে ফিরে যাওয়া আর পুনর্বাসন। এক্ষেত্রে নিশ্চিন্তে ঘরে ফেরার জন্যেও সবার আগে চাই ভেঙে যাওয়া বাঁধগুলো নির্মাণ।

শামীম আল আমিন, বিশেষ প্রতিনিধি
চ্যানেল ওয়ান
০৪/০৫/২০১০

Testimony of a witness to the Aila havoc

ABIR ABDULLAH

I was doing a photo assignment for Oxfam GB with its Oxford based researcher and filmmaker Sandhya Suri at Gabura area in Satkhira district of Bangladesh. The plan was to make an interactive documentary on the effects of climate change with videos and photographs. We started our work on May 13, 2009 after visiting Gabura Village, one of the villages in the country severely affected by changing climate.

Everything in the village was fine before. Despite the crisis of drinking water, poor harvests, increase in salinity and drought villagers' condition was not that miserable until cyclone Aila hit the area.

During a trip to the village before the devastating storm, we saw people of different ages and sexes, women in particular, catching shrimp fry in the nearby river. The fry are sold to the shrimp cultivators. The poor villagers were quite happy with the river since there were hardly any other jobs there other than working in shrimp field although the history of shrimp farming is new.

We met a guy called Abdul Aziz in Lakkhikhali Village who was weeding at a field that was previously used for growing crops. But the increasing salinity in underground water left the field completely unfertile, 32-year-old Aziz said. It is the global warming that resulted in the increase in salinity in water. Many took it as blessings and started cultivating shrimp instead of farming crops. It was mere a shift in business for them. But for others who do not have a piece of land, the shrimp business just worsened their sufferings.

People of Satkhira saw raindrops after eight months that year. It seemed quite relieving though the rains could not clam the area that got almost charred by the scorching heat left by the sun for eight months. But people got some water at least to drink during the rains. Also they did not miss any chance to store rainwater-- as much as possible. They were ecstatic and celebrating rain. I heard a little girl was singing in the rian. Only if they knew that a powerful cyclone was following the rain!!

After working on several cases, i.e landless farmers, shrimp farming, attacks by tigers on villagers and documenting the visuals of environmental degradation, we came back to Dhaka on May 24,2009. Nobody could have even imagined an impending disaster the very next day. I heard about a cyclone warning from a friend in Satkhira but did not pay much attention to it and thought it was a false alarm.

The next day, I was taking rest at home when the news of cyclone Aila striking Satkhira came to me at about 11:00am. I heard that Gabura village was hit hard by the cyclone. Following few minutes I received a phone call from Sandhya Suri and got ready to go

back to Satkhira. We packed up and started our journey around 2:00pm. Within few hours, we reached Aricha ferry station but we had to change our route as no ferry was departing from the station because of rough weather. We had to have a detour and reached Gabura the next morning.

It was the embankment in the village that attracted our attention at first. There was a major breach in it and water was flowing over and through the embankment submerging the entire village and forcing residents to run for shelters with their belongings on the broken embankemnt. I saw many villagers still trying to collect essentials from their houses that submerged in the water. I also saw many others were cooking food under open sky. I heard kids were crying in fear and in hunger. It was surreal to me cause I was there couple of days ago when everything was calm and quiet. I waded barefoot about five kilometers in knee-high water and reached a dry place where 13 dead bodies were kept. Of the dead, eight were children and the rest were women. It was nerve braking. I was the first photojournalist to reach that place and photograph the relatives of the deceased who were lamenting sitting around the bodies. Some were browsing through the dead bodies to identify their missing near and dear ones.

There were several thousand hungry and exhausted people on the embankment. They were not thinking about when they would return home. They were rather worried about the swelling water that might even worsen the situation and force them to move further. The sky was gloomy and smell of dead bodies of human and cattle made the atmosphere miserable. People were horrified. The army was supplying food and water but it was far less than enough.

However I was on duty and started to capture photos for European Pressphoto Agency. Meanwhile panicked people were moving around to carve out a place to spend the night safe, as it was getting dark. At that point one of victims turned to me and started asking me where they would go now. "We've lost everything. There is nothing to eat or drink," he said.

I did not have any answer for him. I turned dumb thinking the condition of these people. I justify my position to me by thinking what could I really do for them while I was on duty? I am a photojournalist. Through my photographs I let the world know about the tragedies of Aila affected people. Photographs speak for themselves. The appeal of photographs galvanizes the government, non-government organizations and other humanitarian bodies to come up with help. I have done everything I possibly could with my camera to help these people. However, now I become frustrated when I see thousands of survivors are still suffering almost a year after Aila. They need urgent help to go back to their homes; it is their right as the citizen of the country not to spend as homeless months after months under open sky and they should be compensated by the government for living such a miserable life for past one year.

জন্ম থেকেই অবহেলার শুরু। জীবনভর বঞ্চনা। জীবনের শেষ কয়টা দিনকেও রেহাই দেয়না নির্মম প্রকৃতি।

Neglected at birth, persecuted through life, abandoned in old age, nature seems to have robbed this man even of the proverbial last straw

PHOTO: MUBASHAR HASAN

Abir Abdullah, Photojournalist
European Press-photo Agency (EPA)
Bangladesh Bureau
he can be reached at abir.epa@gmail.com
02/05/2010

পলায়নপর আমি

জুলহাস আলম

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলে কিছু আছে কি-না তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করার প্রয়োজন নেই, খালি চোখে আইলাদুর্গত মানুষের কষ্ট দেখলেই হবে। দরকার নেই বড় গবেষকের স্বীকৃতি ওই দুর্ভাগা মানুষগুলোর (ওরা মানুষ তো, না-কি?) জীবনের ছিটেফোটা দেখলেই চলবে। কানে বাজে, এখনও বাজছে, '*দুঃখে যাদের জীবন গড়া, তাদের আবার দুঃখ কিসের?*' কথাটি বললেন টঙের মতো মাচায় দাঁড় করানো ঘরে বসা একজন বৃদ্ধ। অর্ধেক তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত। বাম হাত নাড়াতে পারেন না, ডান হাতে জাল বুনছেন, জীবিকার আশায়, সকালের খাওয়া হয়নি ঠিকমতো, রাতের কথা অজানা- তবুও এই সংগ্রাম। একেই বলে বেঁচে থাকা, যদি সত্যিই এটি বেঁচে থাকা হয়!

ঘর গেছে, ভিটা গেছে প্রায় এক বছর হতে চলল। রাষ্ট্র, বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটি তার গ্রামের চারপাশে দেওয়া বেড়িবাঁধটি মেরামত করতে পারেনি। টাকা ঢালা হয়েছে, সি প্লেন এসেছে, এখনও আসছে, স্পিডবোটে লাল নীল পতাকা তুলে শহর থেকে বিদেশীরা আসছেন, আমাদের মতো ভদ্রলোকরা আসছেন, নোট নিচ্ছেন, ছবি তোলা হচ্ছে, ভিডিও করা হচ্ছে- কিন্তু সেই বৃদ্ধের নিজের ভিটেয় ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই। থাকেন ভাঙা বেড়িবাঁধের ওপর বাসা বেঁধে। তাকিয়ে দেখেন, আঙুল তুলে দেখান ওইখানে আমার ঘর ছিল। ওইখানে বাবার কবর। কিন্তু আর কোনও দিন ফেরা হবে না, কোনও আশা পাই না। তিনি বলে যান, আমি তার মুখের দিকে তাকাই না, প্যান্ট-শার্ট পরা এই আমি, গায়ে সুগন্ধি মাখানো এই আমি, পারি না তাঁর চোখের দিকে তাকাতে। মাথা নিচু করে নোট নিই, চাকরি করি, মাস গেলে বেতন, নতুন গাড়ি কেনার ভাবনা, ছেলের স্কুলের মাইনে দেওয়ার বিলাসিতা- তাই নোট নিই, দ্রুত লিখতে থাকি- ভাবি এই বুঝি তিনি আমার লজ্জা টের পেয়ে যান, এই বুঝি আমার জাত যায়। ভয়ে থাকি- কখন বলেন, কী হবে এই সব ছাইপাঁশ লিখে? দ্রুত পালাই তাঁর সামনে থেকে, আমাকে আরেকজন শিকার ধরতে হবে- যার গল্প অনেক কষ্টের, যত কষ্ট, তত ভাল- যত যুদ্ধ, তত ভাল- জীবনযুদ্ধের গল্প, আমার প্রতিবেদন খুব ভাল। বিদেশী পাঠক পড়বে- আর বলবে আহ্ ওহ্। This is Bangladesh! OMG.

এক হিসাব অনুযায়ী, ২০০৯ সালের ২৫শে মে'র ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্তদের একটি বড় অংশ এখনও ঘরহীন, ভিটেছাড়া। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের এই মানুষগুলোর জীবন কোথায় যেন আটকে গেছে। প্রায় ১ লাখ লোক এখনো বেড়িবাঁধে বসবাস করছে বলে ইউএনডিপি'র এক সমীক্ষায় দেখা গেছে। রাস্তা নেই, স্কুল নেই, বাজার নেই, নদীর লোনাজলে বিলীন হয়ে গেছে অশীতিপর বটগাছটি- নেই কোনও গৃহপালিত পশু, নেই ঘাস, নেই ফুল। এর আগে সিডর এসে থাবা মেরেছে, সেই ক্ষতি পোষাতে পোষাতে আবার আইলা। আইলা নীরবে এসেছে। তার চেয়ে বেশি ছিল আমাদের নীরবতা- আমরা বুঝিনি, সরকার বোঝেনি- যখন বুঝেছে কী ঘটেছে ওই সমুদ্রপাড়ে- সরব হওয়ার ভান করেছে, এখনো চলছে ভান করার কলাকৌশল। ক'মাস আগে অক্সফামসহ ১৮টি সংগঠন একযোগে আবেদন করেছে সরকারের কাছে। ঘুম ভাঙানোর ডাক দিয়েছে। কিন্তু জেগে যে ঘুমিয়ে থাকার ভান করে, কী করে তার ঘুম ভাঙানো যায়?

জানা গেলো, টাকা এসেছে, টাকা আসছে। জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় আমলারা খুবই তৎপর। কার হাতে থাকবে টাকা খরচের মূল চাবিকাঠি- সে নিয়ে টানাপোড়েন। এনজিও গোষ্ঠী জনসেবার ঝাণ্ডা তুলে সদা তৎপর- সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেওয়ার স্লোগান নিয়ে জনতার কাতারে দাঁড়িয়ে লম্ফঝম্ফ। কোনও কিছুর কমতি নেই।... নেই কেবল কোনও প্রতিকার।

কোথায় যাবে এই মানুষগুলো? কোথায় তাদের ঠিকানা? সামনে বর্ষা আসছে আবার। শীত কেটেছে কষ্টেসৃষ্টে, কিন্তু বর্ষায় ঠাঁই নেবে কোথায়? ইউরোপীয় কমিশন ডাক দিয়েছিল যাতে বর্ষার আগেই বাঁধ মেরামত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বসলেন বৈঠকে। জানলাম সেনাবাহিনীকে লাগিয়েছেন। কিন্তু কোথায় সমাধান? কেউ কি জানে- কবে হবে? কবে ঘরে ফিরবে এই মানুষগুলো? শিশুরা স্কুলে যাবে কবে? আমেনা বেগম বললেন- 'বুঝতেছি না কী করব? স্বামীরে কইছি- চলেন ঢাকায় যাই। উনি কইলেন, ভিটা ছেড়ে কোথায় যাবো?'

আবার আমার চোখ ভিজে আসে, বুঝতে দিই না আমেনা বেগমকে। দূরে তাকাই, থই থই পানি, প্রচণ্ড বাতাসে ভর করে আছাড় খাচ্ছে বেড়িবাঁধে। ভাবি দ্রুত ফিরে যাই, দূরে সি প্লেন অপেক্ষায় আছে, যেন গাঙচিল, প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের খাবার অপেক্ষা করছে সি প্লেনে, খেতে হবে পেটপুরে। দ্রুত পালাতে চাই এখান থেকে, এগিয়ে যাই অপেক্ষমাণ স্পিডবোটের দিকে। পেছনে ফিরে তাকাই না- তাকানোর সাহস আমি হারিয়ে ফেলেছি।

জুলহাস আলম, প্রতিনিধি
এসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)
০২/০৫/২০১০

Photo Testimony of the Aila Havoc

ANDREW BIRAJ

"I've lost everything in the storm. My younger son is still missing. I didn't even eat anything in last two days. Can you please help us at least providing some drinking water?" Amena Begum stands in front of her temporary shelter on broken embankment in Gabura Shatkhira, Bangladesh, after being displaced by a huge tidal surge during the time of cyclone Aila.

"I don't know when I will be able to move into my own house. The whole village is inundated by salt water. No one is paying attention to us. Our children are dying in hunger. None but only God knows the end of our misery," 65 years old Hamida Begum weeps, as she chops wood to build a temporary shelter on a river dam. Hamida lost her everything after been displaced by a huge tidal wave caused by cyclone Aila.

Andrew Biraj is a Thomson Reuters Photographer , 16/05/2010

সাংবাদিকের দিনলিপিতে ‘আইলা কষ্ট’!

পান্থ রহমান

সাংবাদিকদের একপেশে হতে নেই। সংবাদকর্মী হয়ে ওঠার জন্য এটি অবশ্যপালনীয় শর্ত। তাই সংবাদ সংগ্রহ বা লেখার সময় তাদের অনুভূতিপ্রবণ হওয়া চলে না। যে কারণে সাংবাদিকদের মধ্যেও হরহামেশা প্রশ্ন ওঠে, সাংবাদিক কে? কী তার কাজ? সাংবাদিক কী কেবলই একজন ‘ধারাভাষ্যকার’? সাংবাদিকের নীতিবোধ নিয়ে এমন নানা কথা আছে, প্রশ্ন আছে। যেমন ধরুন, রাস্তায় কাউকে গণধোলাই দেওয়া হচ্ছে। ফটোসাংবাদিক তাকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে ছবি তুলছেন। প্রশ্ন ওঠে সাংবাদিক তাহলে কীভাবে ‘জাতীর বিবেক’ হন?- এসব বিতর্ক অবশ্য অনেক পুরোনো।

ভাগ্যিস, তেমন সাংবাদিকতা এখানে করতে হচ্ছে না। করতে হলে নিজেকে ‘নীতিবান সংবাদকর্মী’ হিসেবে ধরে রাখা যথেষ্ট কষ্টের হতো। অন্তত সিডর ও আইলা নামের দুটো প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কষ্টের কথা তাদের মুখ থেকে শোনার পর তো বটেই।

লেখার মূল অংশে যাওয়ার আগে দুটো গল্প-

এক.

আকাশের মেজাজটা বেশ খারাপ। কিছুক্ষণ পরপরই এসএলআর ক্যামেরার শক্তিশালী ফ্ল্যাশ লাইটের মতো ঝলকে উঠছে। যেন মানুষগুলোকে চমকে দিতে চায়। চারদিকে শোঁ শোঁ আওয়াজ। সাতক্ষীরার সমুদ্রপাড়ের মানুষগুলোর জন্যে এটা মোটেও নতুন কিছু নয়। তাদের বুঝতে কষ্ট হলো না যে, ঝড় আসছে। তখনও হাতে থাকা কাজগুলো সেরে নিচ্ছিলেন রাবেয়া খাতুন। কিন্তু হঠাৎই যেন তাঁকে ধমক দিয়ে উঠল প্রকৃতি। করছিস কী, এ-তো সাধারণ ঝড় না। সাইক্লোন, আইলা! কিছু ভেবে অথবা না ভেবেই রাবেয়া খাতুন তৎপর হয়ে উঠলেন। সংসারের বাকিদের দায়িত্ব বড় ছেলের (১৭ বছরের) হাতে তুলে দিয়ে নিজে নিলেন স্বামীর দায়িত্ব। স্বামী প্যারালাইজড। রাবেয়ার মনে হলো, এবারের ঝড়টা একটু দ্রুতই তাঁদের বাড়ির দিকে দৌড়ে আসছে। আগে এমনটা কখনও দেখেননি তিনি।

হাতে সময় নেই। প্যারালাইজড স্বামীকে পলিথিনে মুড়ে নিজেদের নৌকার পাটাতনে ফেলে রাখলেন। এরপর নৌকাটাকে গাছের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধলেন। তারপর নিজেরা ছুটলেন নিরাপদ আশ্রয়ে। প্যারালাইজড স্বামীকে টানাহেঁচড়া না করার জন্যেই তাঁকে এভাবে রেখে যেতেন রাবেয়া। এমনটি আগেও করেছেন। ছোট ছোট ঝড়গুলোর সময় স্বামীকে এভাবেই রেখে দিয়েছেন। বেঁচেও গেছেন রাবেয়ার স্বামী। ভেবেছিলেন এবারও বেঁচে যাবেন। কিন্তু বাঁচেননি রাবেয়ার স্বামী।

রাবেয়া আর তাঁর সংসারের বাকিরা নিজেদের জীবনটা নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলেন। তাঁরা বেঁচে গেছেন। তবে আর কিছু বাঁচানো যায়নি। গরু-বাছুর, ছাগল, ঘরের আসবাব; কিছুই না। এমনকি দিন চারেকের যে চাল-ডাল তোলা ছিল, সেগুলোও না। এখন তাই রাবেয়াদের যুদ্ধকাল চলছে। দু’বেলা দু’মুঠো খেয়েপরে বেঁচে থাকার এ যুদ্ধ যেন প্রকৃত যুদ্ধের চেয়েও কঠিন।

দুই.

রিপন; পুরো নাম বলতে পারে না। বয়স ১৩। উচ্চতা ৪ ফুট ইঞ্চি তিনেক। হ্যাংলা শরীর। মাথায় ৩০ লিটার পানি-ভরা মাটির কলস। পুকুর থেকে পানি তুলে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, বাড়ি পৌঁছুতে আরো মাইল দেড়েক হাঁটতে হবে। কেন বাবা, পুকুরের পানি কেন? রিপন প্রশ্নটা বুঝল কি না সেটা আর জানা হলো না। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। হাজার হোক, বয়স তো অল্পই, না? পেছনেই রিপনের বাবা। সাংবাদিকের কৌতূহল মেটাতে নিজের মাথার ভরা কলসটা নামিয়ে দাঁড়ালেন আলী আব্বাস। জানালেন, আইলার পর এখানে খাবার পানির দারুণ সমস্যা চলছে। যেখানেই নলকূপ বসানো হয়, নোনাপানি ওঠে। একমাত্র মিঠাপানির আধার এই পুকুরটি। এটিই এখন সম্বল হয়ে আছে, আইলা ক্ষতিগ্রস্ত হাজারো মানুষের।

গল্প দুটো নিছক নয়। বাস্তব ঘটনাই। আইলায় ক্ষতির শিকার মানুষদের নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে এ গল্পগুলো পাওয়া গেছে। একজন অনুভূতিপ্রবণ সাংবাদিকের ডায়েরির দুটো পাতার কিছু অংশ। এই প্রতিবেদকের দিনপঞ্জির আরও

দুটো পাতায় যা লেখা ছিল তা এই রকম:

সকাল ৮টা। উজ্জ্বল আকাশ। একটু বেশিই উজ্জ্বল। বেশ গরম পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু সময়টা খারাপ যাচ্ছে না। গাড়িতে তাপানুকূল ব্যবস্থা সচল আছে। কিন্তু গাড়ি থেকে নামতেই গরমটা কামড়ে ধরলো। শ্যামনগর নৌকাঘাটে পৌঁছুতেই পরনের জামা ভিজে একাকার। জানা গেলো, ইঞ্জিনের নৌকা

ভাড়া হয়ে গেছে সাংবাদিকদের জন্যে।

টেলিভিশন সাংবাদিকের আবার নানান কসরৎ। কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে যাচ্ছে। যেতে কষ্ট হচ্ছে কি-না, কেমন ঝামেলা পোহাতে হয়েছে– এগুলো চিত্রে ধারণ করা থাকলে মানুষ বেশ খায়! এমনই করতে হলো। ক্যামেরাম্যান বার-দুয়েক 'কাট' বলায়, তিনবার সিঁড়ি দিয়ে নৌকায় ওঠার কসরৎ।

শ্যামনগর ঘাট থেকে নৌকা করে পাড়ি দিতে হবে খোলপেটুয়া নদী। নৌকা চলছে পশ্চিম দিকে মুখ করে। উল্টো দিকে তখন সূর্য রীতিমতো চোখ রাঙানো অবস্থায়। গায়ের শার্ট ঘামে ভিজে একাকার। কিন্তু সাংবাদিকের যে নিস্তার নেই। সংবাদ সংগ্রহই তার কাজ। ক্যামেরাম্যান দু'চারটে 'প্যান শট' (এক পাশ থেকে আরেক পাশ ঘুরানো) নেওয়ার কসরৎ করছে। মাঝে একটা ফ্রেমে ধরা হলো প্রতিবেদকের ঘামে ভেজা শার্টের ছবিও। সংবাদচিত্রটা পুরো দাঁড়িয়ে গেলো। সাংবাদিকের স্বস্তি!

আধা ঘণ্টার নৌকা সফর শেষেই দেখা হয়েছিলো রাবেয়া খাতুনের সঙ্গে। তার সঙ্গে আবেগ ভাগ করে নিয়ে সামনে এগুতেই দেখা গেলো ক'টা বাচ্চা খুব মন দিয়ে খেলছে। বাইরের আগুন্তুকের দিকে তাদের খুব একটা মন নেই। আগুন্তুকরা এগিয়ে যায়, ওরা তাদের পাত্তাই দেয় না।

- বাবা, তোমার নাম কী?
- আকাশ।- জাম্বুরার বলে লাথি দিতে দিতে বলে ছেলেটি।
- তোমাদের বাড়ি কই?
- ওই দিকে!- হাত দিয়ে যেদিকটায় ও দেখালো সেদিকে আসলে বিস্তীর্ণ জলরাশি।

আসলে ছেলেটি যে গ্রামটি দেখাতে চেয়েছে সেটির নাম গাবুরা। সেখানে দিনের যে সময়ই পৌঁছান একটা দৃশ্য চোখে পড়বে। সুপেয় পানির জন্য হাতে হাতে পাত্র নিয়ে মানুষের ছোটাছুটি। হাহাকার। ক'জন নারী তখন স্নান করছেন। ক্যামেরা সহকারীকে ছবি তোলায় সাবধানী হতে বলে সামনে যাওয়ার ব্যস্ততা। দেখা হয়, ইদ্রিস আলীর সঙ্গে। বয়স সত্তরের কোঠায়। তিনি অবশ্য দাবি করেন, নব্বুই। কুঁজো হয়ে চালের ভেতর থেকে কাঁকর বাছায় ব্যস্ত ছিলেন ইদ্রিস। জানালেন, 'এ জম্মেও' তিনি আইলার মতো তুফান দেখেননি।

- বাবা, এই খানি উপর দিয়া পানি উঠছিলো (হাত দিয়ে পানির উচ্চতা বোঝালেন তিনি)। কেউ বাঁচবো না মনে হইছিলো। শেষে দেখলাম আমি বুইড়াই বাইচা গেছি। (ইদ্রিস বিজয়ীর হাসি হাসেন)।

বৃদ্ধ ইদ্রিসই জানালেন, অনেক অনেক এনজিও হওয়ায় চাল-ডালের অভাব একটু কমই আছে। অভাব শুধু পানির। খাবার পানির। বয়স্ক মানুষটির কণ্ঠে কিছুটা 'আতঙ্ক'।

- এই পুকুরটা যদি শুকায়ে যায়?

সত্যিই তাই। একটা মাত্র পুকুর খাবার পানির জোগান দিচ্ছে পুরো হাজার পাঁচেক মানুষের। যদি শুকিয়ে যায়? এর কোনও উত্তর আপাতত কারো জানা নেই। এমনকি ওই গ্রামটি যে থানায় পড়েছে, সেই থানার নির্বাহী কর্তারও না।

'দুপুরের খাবারের সময় হয়ে যাচ্ছে' মনে করিয়ে দিলেন, এনজিওকর্মীদের কেউ। অথচ সেদিকে কারও খেয়াল নেই। আরেকটু সামনে হাঁটতেই একটা স্কুল। তালা বন্ধ। হতেই হবে, সামনে এক হাটু কাদা। ওখানে বাচ্চারা পড়তে আসবে কীভাবে? জানা গেলো, বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় স্কুলটি বন্ধ থাকে। কালবোশেখির সময়। ঝড় এলে তো কথাই নেই। সেই স্কুলের শিক্ষার্থী সিতারা (আসল নামটা লেখা হলো না)। সে যা বললো তার সারকথা হলো: স্কুলে ঠিক মতো পড়ালেখা হয় না। শিক্ষক আসেন না ঠিক মতো। আসবেন কীভাবে? শিক্ষক তো থাকেন ওই পারে (নদীর ওপারে, শহরে)। সেখান থেকে প্রতিদিন আসা তো একটু কঠিনই, নাকি? আবার এ-ও ঠিক, শিক্ষক স্কুলে এলেও সব শিক্ষার্থীর দেখা মেলে না। দেখা মিলবে কীভাবে? ওদের কাজ আছে না। মাছ ধরা, পুকুর থেকে পানি নেয়া, একটু বড় হলেই সুন্দরবনে গিয়ে মধু সংগ্রহ করা; কত কাজ! এলাকার শিশুরা তাই বেশিরভাগই থাকছে 'পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা'র বাইরে। এর ভেতর থেকেই দু'একজন হয়েছেন তানিয়ার মতো এনজিওকর্মী, তাদের লেখাপড়ার দৌড় মাধ্যমিক পর্যন্ত।

'যাদের দু'বেলা খাওয়ার পানি জোটে না তাদের আবার পড়াশোনা!' কথাটি খুব সত্যি। আইলায় আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে গাবুরা, আশাশুনির মানুষগুলো ঠিকমতো পানিও পায়নি। গ্রামরক্ষা বাঁধ ভেঙে সাগরের নোনা পানি ঢুকে পড়ায় এখন গভীর নলকূপের পানিতেও লবণ, নোনা স্বাদ। ওই লোকগুলোর এখন পুকুরের পানিও লিটার দরে কিনে নিতে হয়। লিটার দশেকের এক কলস পানি কিনতে গুণতে হয় ৮ থেকে ১০ টাকা। যাদের নিজের নৌকা আর অনেকগুলো কলস আছে তারাই শুধু নৌকায় করে বাড়ি বাড়ি পানি দিয়ে যায়।

-পানি কিনে খেতে হবে, ভাবতিও পারিনি বাবা। এখন তাই করতি হচ্ছে।

কথাগুলো বলছিলেন, নীরেন্দ্র বিশ্বাস। অল্প-বিস্তর ভুল-শুদ্ধ ইংরেজি মেশানো তাঁর কথায় এতটুকু স্পষ্ট হলো যে, এভাবে কিনে পানি খেতে তিনি 'ইউসড টু' নন। নীরেন্দ্র বাবু (আসল নাম লিখলে রিলিফ পেতে ঝামেলা হতে পারে, তাই কল্পিত নাম) অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। হাত পাততে তাঁর সম্মানে বেশ লাগে। তাঁর বাড়ির বৌ-ঝিয়েরা হাঁটুর কাপড় তুলে মাছ ধরবে, ভাবতেও পারেন না ভদ্রলোক।

- এখন আমার ঘরের বউ-ঝিদের পানিত্ নামতে হচ্ছে। বাবা, এরচে দুঃখির আর কী হতি পারে?

বলতে বলতে নীরেন্দ্র বাবুর চোখ থেকে পানি ঝরতে থাকে। তাঁর অভিযোগ, যারা তুয়াজ (তোষামোদ) করতি পারে, হাতে-পায় ধরতি পারে, তারাই রিলিফ পাচ্ছে, বাবা। বাকিরা পাচ্ছে না। ইট ইস নট ফেয়ার। আপনি কী বলেন, ঠিক বলিছি?

জবাবের অপেক্ষা না করে আবার বলতে থাকেন, আমাগের তো অনেক টাকা নেই। কিন্তু সম্মান আছে। বাড়ির দু'জন বিএ (বিএ পাস)। আমি আর আমার ছেইলে। কোথাও যে গিয়ে ও চাকরি করবি, তারও তো উপায় নেই। তাহলি, বাড়ির দেখাশুনা করার তো কেউ থাকে না।

তাঁর কথায় অন্তত এটুকু স্পষ্ট হয়, ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম করেছে কিছু স্থানীয় এনজিও। এই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে যারা সেমিনার সিম্পোজিয়াম ফাটিয়ে ফেলেন, তারাও যদি অনিয়মের মিছিলে যোগ দেন, তাহলে তো আর কিছুই থাকে না। আর তেমনটা হলে, একজন অনুভূতিপ্রবণ

সাংবাদিকেরও মন খুলে সমালোচনার বিকল্প থাকে কী?

খাবার জলের সংকটের বিষয়টি মেনে নেন প্রশাসনের হর্তাকর্তারাও। কিন্তু এই ব্যাপারে তাদের করণীয় জানতে চাইলেই অমায়িক একটা হাসির দেখা পাওয়া যায় তাদের মুখে। তাদের নাকি কিছুই করার নেই! ভদ্রলোকদের এই 'অমায়িক হাসি' কতটা নিষ্কলুষ, সেটা কাউকে বলে দিতে হয় না। ওই থানার নির্বাহী কর্তার কথাই ধরুন। তিনি তো বলেই ফেললেন, আমাদের আসলে এরচেয়ে বেশি কিছু করার নেই। প্রশ্ন হলো, কীসের চেয়ে বেশি কিছু? কতটা করেছেন তারা?

বেলা গড়াচ্ছে। সূর্যটাও তেজ হারাচ্ছে। কিন্তু সংবাদকর্মীদের কাছে পেয়ে মানুষের কথার তেজ যেন বাড়ছে। কষ্টের কথা বলতে গিয়ে একটু আগে যিনি চোখের পানি ফেলেছেন সেই নীরেন্দ্র বাবু এবার প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন।

- বাবা, আমার ভাতিজ্যা চইলে গেছে গ্রাম ছাইড়ে। ইন্ডিয়া।
- কেন?
- কী করবি? প্যাটে ভাত থাকা লাগবি তো!

নীরেন্দ্র বিশ্বাস জানালেন, এলাকার অনেকেই এখন পেটের দায়ে ভিটেমাটি ছাড়ছেন। বৌ-বাচ্চা ওই বাঁধের ওপরের অস্থায়ী ঘরে রেখে পুরুষরা চলে যাচ্ছেন কাজের খোঁজে। কোথায় যাচ্ছেন?- জানতে চাইলে নীরেন্দ্র বাবু জানান;

- কুথায় আর, কেউ ঢাকায়, কেউ চট্টগ্রাম, কেউ খুলনা, কেউ সাতক্ষীরার মূল টাউনে। আর যাদের আত্মীয়স্বজন আছে তারা ভারতে পারি দিচ্ছেন।

তার মানে, এনজিওগুলোর দেওয়া তথ্যগুলো ঠিক? বাংলাদেশ থেকে মাইগ্রেশন হচ্ছে? যাদের 'ক্লাইমেট রিফিউজি' নাম দেওয়ায় বেশ বিতর্ক উঠেছিলো দেশজুড়ে। এ ব্যাপারে খুব ভালো করে খোঁজ নিতে হলো। অবশেষে পাওয়া গেলো এমন একজনকে যার চাচাতো ভাই পাড়ি জমিয়েছে ভারতের বনগাঁওয়ে। সত্যি কি?

- সত্যি মানে। অবশ্যিই সত্যি। আমার ভাই কেন, ইরকম অনেকেই গিয়েছে। ঠিক মতো খাবার খাতি হলি, এনজিওআলাদের কাছে হাত পাততি হয়। কাম (কাজ) নেই। কী করবি বলেন? আমিও তো চইলে যাওয়ার কথাই ভাবতিছি।

নীরেন্দ্র বাবুকে খুব অসহায় মনে হলো। চোখমুখে কালো ছাপ। মুখ শুকিয়ে গেছে। হয়তো নিজের ভিটে ছেড়ে আরেক দেশে যেতে চান না তিনি।

নীরেন্দ্র বাবু যা বললেন তার মোদ্দা অংশটুকু হলো, ওই এলাকার মানুষের খাবারের সংকটের চেয়ে বিশুদ্ধ ও সুপেয় পানির সমস্যাটাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। সাতক্ষীরার শ্যামনগর আর আশাশুনি উপজেলার বেশ কিছু অংশের মাটিও লবণ-পানির আক্রমণের শিকার।

- আমার বাড়িতে ১১ খান আম গাছ ছিলো, নাইরকেল গাছ তো ম্যালা। অন্য ফলের গাছও ছিলো। এহন কিচ্ছু নেই।

নীরেন্দ্র বাবু আর কথা বলতে পারেন না। তাঁর গলা ধরে এসেছে।

সাংবাদিক বুঝি আর থাকা গেলো না। অনুভূতিপ্রবণ হতেই হলো। বাঁধের ওপর আশ্রয় নেয়া ওই মানুষটির চোখ তখন বিস্তীর্ণ নদীর দিকে। মনে হলো লোকটা বলতে চাইছেন, দেখেন, চারদিকে থৈ থৈ পানি। অথচ মুখে দেওয়ার উপায় নেই।

- পশুপক্ষিও থাকবার জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। পাবি কীভাবে বাবা, গাছ-গাছড়া থাকতি হবে তো!

বোঝা গেলো, জীববৈচিত্র্য নষ্ট হওয়ার কথাই নিজের মতো করে বলতে চাইছেন তিনি। মনে পড়ে গেলো, তাঁর এই কথাগুলো তো বিশেষজ্ঞরাও বলেন, তবে একটু গুছিয়ে, ভিন্নভাবে।

আইলার কথা স্মরণ করতে বলায় আহম্মদকে বেশ উদাস দেখালো। ২৫ মে ২০০৯, তারিখটা তিনি ভুলেননি। বললেন, কিচ্ছু বুইঝা উঠার আগেই সব উইড়ে গেলো। সাতক্ষীরায় একটা নাগরিক সমাজ আছে, যারা কিঞ্চিৎ প্রতিবাদী। মাঝে-মাঝে প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে যান। মন্ত্রীরা গেলে তাদের সঙ্গে উচ্চস্বরে কথা বলার চেষ্টা করেন। আহম্মদ তাদেরই একজন। ইদানিং তারা বেশ সোচ্চার; তারাই বলছেন পানিসম্পদ, কৃষি, বন ও পরিবেশ, খাদ্য ও দুর্যোগ আর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মধ্যে নাকি সমন্বয় নেই। এ ব্যাপারে ওই এলাকার অনেকেরই প্রশ্ন, ভাই ওটা কবে ছিলো? লোকগুলো জানালেন, ২০১০ এর মার্চের মধ্যেই নাকি বাঁধ তৈরির কাজ শেষ হওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিলো সরকারের। সেটি যে হয়নি, তা তো দেখাই যায়। কিন্তু কবে হবে, তা-ও বলতে পারে পানি উন্নয়ন বোর্ড। যদি না পারে, তাহলে মানুষভোলানো এই কাহিনী আর কতদিন চলবে?

পানি উন্নয়ন বোর্ডের উন্নাসিকতা সব কিছুকে হার মানিয়েছে। বাঁধ মেরামত না হওয়ার ব্যাপারে তাদের কোনও উত্তর নেই। তবে কিছু অজুহাত তৈরি আছে। স্থানীয় সচেতন সমাজ অবশ্য অজুহাতকে দেখছেন 'আইলা বাণিজ্য' হিসেবে। কীভাবে? সে অনেক কথা! শুনতে পাওয়া যায়, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে নাকি ঠিকাদারদের জব্বর দহরম-মহরম। তারাই নাকি কোনও কিছুর বিনিময়ে রাশ টেনে রেখেছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন তৎপরতার! আর তাদের ওই 'কোনও কিছু'র কারণেই পানি উন্নয়ন বোর্ডও 'ভুলিয়ে-ভালিয়ে' রাখার চেষ্টা করছে হতভাগ্য মানুষগুলোকে। তাদের সঙ্গে নাকি আবার মহারথি চিংড়ি চাষিরাও 'ঘি-এ পানি ঢালা'র দায়িত্ব পেয়েছেন। ঢালছেনও। শুনতে পাওয়া গেলো, ওই ঘি-ই নাকি, সব নষ্টের মূল। তার ওপরও তো কর্তৃপক্ষ আছে, কর্তাব্যক্তিরা আছেন, আমাদের নেতারা আছেন, আপনারা একটু তাকান না সেদিকে! এই ছোট্ট একটা দেশে এতোগুলো মানুষ এতদিন ধরে কী যন্ত্রণায়ই না আছে!

পান্থ রহমান, সিনিয়র স্টাফ করেসপন্ডেন্ট
চ্যানেল আই
০৫/০৫/২০১০

The nexus of nature and corruption produces endless miseries in a storm-hit land

WASIM BIN HABIB

When Oxfam's Mubashar Hasan requested me to give a testimony on the impact of cyclone Aila, I was in a real difficulty because I could not think of a proper introduction. It's not that the issue is complicated but because it has too many dimensions.

Whenever I think of Aila affected people, I see images of hopeless faces, extreme adversities, pain of losing near and dear ones, hunger, crisis of water, struggles against the cruel nature and the people looking at a bleak future. Each of these phenomena deserves to form an introduction of this writing.

Until now, I visited the Aila-hit coastal districts of Satkhira and Khulna three times. I personally am moved by the sufferings of people in that area. In fact the nature of their sufferings in past one year is inexplicable. It is like people are sinking deep into darkness day by day with virtually nothing left to live.

My first visit to Satkhira was soon after the cyclone that ripped through the area and created havoc in people's life in May last year. People were scrambling for food and drinking water. It has been a year since the storm hit but I still cannot forget the few sentences of an aged woman of Gabura union under Shyamnagar Upazila in Satkhira. She was telling me, "You will not realise how it feels when your children cry for food and you have nothing to feed them."

She was among thousands who had to come upon the embankment with children since tidal surge broke through coastal embankment during the cyclone.

Five months later, when I revisited the affected upazilas in Shyamnagar, I found the situation even worse than the past as the people were still living on the embankments with no work to feed the families.

By contrast, the government initially came up with food and other modes of assistance and continued to provide assistance for a few months right after the cyclone. But it was not enough for them. Also, in my opinion, media initially did not give due importance to it and those sufferers slipped out of spotlight. On the other hand, the international donor agencies did not come up with what they pledged before.

Unfortunately almost a year passed and still many people are living on the embankment under the open sky in three unions -- Gabura, Dacope and Koyra. They are living a miserable life with lack of proper food and water or sanitation facilities, amid scorching heat. Moreover, lack of work became a crude reality. Many people left the area for safer

জোয়ারের পানির সঙ্গে দুর্নীতির মিতালি, ফলাফল: দীর্ঘমেয়াদী মানবিক বিপর্যয়।

The nexus of nature and corruption produces endless miseries.

PHOTO: MONEERUL ISLAM

places especially in Satkhira and Khulna towns after failing to bear hardships.

The reconstruction of embankments was the main demand put forward by the sufferers for past twelve months since they wanted to return their homes and start their life again. The government with the help of law enforcing agencies and locals repaired the embankments but many of the dykes swamp broken during the gons (new-moon-tide), inundating the areas anew, destroying their hopes to save their last belongings.

I don't want to go in detail about how such a large stretch of the embankments collapsed in a day but I found that the negligence of the authorities concerned and corruption in the repairing work prolonged the woes of the survivors.

We all know the destruction wreaked by cyclone Sidr. But people of the Sidr-hit areas restarted their lives after few months. But cyclone Aila, which might not be as strong as Sidr, made the coastal areas a hell on earth. The affected people could not return to their home even after a year.

How do we the so-called civilised people live in peace forgetting these people who even haven't got safe water to drink? They are the citizens of the country and it is the duty of the government to ensure their rights.

We want the people to go back to their homes and lead decent lives. We want their immediate rehabilitation and also want that the government to take necessary steps so that the people would not become refugees once again if any cyclone hits the areas in coming monsoon.

Finally, we want to see that the government is taking serious steps to track those corrupt people involved in reconstruction of the embankments and it is a necessity now to have a law which will ensure the prompt management of the disaster response work from responsible government agencies.

Wasim bin Habib, Staff Correspondent

The Daily Star

07/05/2010

সেই কবে আইলা তারপর এতো দিনেও...

ঝুমুর বারী

নাগরিক জীবনের সব সুবিধা থেকে কতটা দূরে থাকতে পারে একজন মানুষ! পানি, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, চিকিৎসা বা জীবন ধারণের অন্যসব আবশ্যিক উপকরণের অনুপস্থিতিতে কেমন হয় মানুষ পরিচয়ে বেঁচে থাকা?

আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বেঁচে থাকার যুদ্ধ দেখার জন্যে ঢাকা থেকে যখন রওনা হলাম, তখন ধারণা ছিল না- কেমন আছে তারা? কত দূরে আছে? শুধু জানতাম একটি বাঁধ দরকার। তাহলেই সমস্যার সমাধান। ধারণা ছিল, হয়তো বাঁধ পুনর্নির্মাণ হলে রক্ষা পাবে তাদের ফসল, পরিবর্তন আসবে যোগাযোগ ব্যবস্থায়। কিন্তু এরকম চিন্তার সমস্ত গণ্ডি ছাড়িয়ে যা দেখলাম, তার বর্ণনা দেওয়া কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

ভোরে শ্যামনগর থেকে রওনা হলাম আমরা। নদী পার হয়ে যাব সেইসব অসহায় মানুষের কাছে। নদীর নাম খোলপেটুয়া। সাগর মোহনার নদীটির হিংস্র ঢেউ যেন মানুষের কাছে ত্রাস। এলাকাবাসীর ভাষায়– এই নদীকে বিশ্বাস করা যায় না। মুহূর্তে এই নদী বদলে ফেলতে পারে এর রূপ। ভাসিয়ে নিতে পারে বসতভিটা-সাজানো-গোছানো সংসার-জীবনের সব আয়োজন।

নদী পেরোনোর আগেই চোখে পড়ল মাইলের পর মাইল চিংড়ি ঘের। দূরে সুন্দরবন। বনের বাঘ খাবারের খোঁজে প্রায়ই লোকালয়ে হানা দেয়। নৌকায় নদীর কিছুটা যাওয়ার পর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী আমাকে জানালেন, দূরে যে উঁচু ঢিবি দেখা যাচ্ছে সেটি বাঁধ। আরেকটু এগিয়ে দৃশ্যমান হলো বাঁধের ওপর মানুষের বসতি। হাজার হাজার ঘর আর হাজার হাজার মানুষ। কিছুটা কাছে যাওয়ার পর মানুষগুলো ভালোভাবে নজরে আসতে শুরু করল। তাদেরও নজরে আসলাম আমরা। আর তখনই বাঁধবাসী মানুষগুলোর অনেকে রিলিফের নৌকা ভেবে অনুসরণ করতে শুরু করল আমাদের নৌকা। লজ্জা আর অপমানে মনে হলো আমি কেন এসেছি? আমাদের ক্যামেরার ল্যান্স কি এদের পেটের ক্ষুধা মেটাতে পারবে!

পাড়ে পৌঁছানোর আগেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার নজরে এলো। দলে দলে মানুষ নৌকায় কলস, ক্যান, বোতল নিয়ে ছুটছে বাঁধের দিকে। জানতে পারলাম, পানি আনতে যাচ্ছে ওরা। এই এলাকার মানুষের একটি বড় কষ্টের নাম- খাবার পানি। নলকূপে পানি ওঠে না। আর জলাধার-পুকুর যা ছিল, সেগুলো এখন ভরে আছে বাঁধ ভেঙে ঢুকে পড়া নোনাপানিতে।

কথা হলো এক ঘের-শ্রমিকের সঙ্গে। এখন অবশ্য তাঁর কোনও কাজ নেই। তিনি তাঁর মা আর বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে নৌকার বৈঠা বেয়ে বহুদূরের গ্রাম থেকে পানি আনতে যাচ্ছেন। জানালেন, তাঁর এলাকায় এক বাড়িতে নলকূপ আছে। কিন্তু গ্রামজুড়ে পানির এতই চাহিদা, চাপ সামাল দিতে গৃহকর্তা প্রায়ই নলকূপের হাতল খুলে রাখেন, যেন কেউ পানি ওঠাতে না পারে। তিনি জল আনতে যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে অবশ্য কোনও নলকূপ নেই। আছে একটি পুকুর। যার নাম দৃষ্টিনন্দন। নাম বাহারি হলেও পুকুরের পানি শ্যাওলা রঙের, আর সেই পুকুরই এখন বহু মানুষের জন্যে পানীয় জলের একমাত্র উৎস।

বাঁধের ওপর কিছু দূর হেঁটে দেখা মেলে সেই পুকুরের। কয়েকশ' মানুষ পানি নিচ্ছে পুকুর থেকে। ক'টি গরু আর কুকুরকেও দেখলাম পানি খাচ্ছে এই পুকুরে। কেউ এই পুকুরে গোসল করে না। কারণ এর পানি তাদের খেতে হয়। এলাকাবাসী জানাল, গেল বর্ষায় পুকুরে জমা বৃষ্টির পানি আট মাস ধরে মানুষের খাবার পানির চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে। ঘোলা আর গন্ধে ভরা এই পানি। তবু লবণাক্ততামুক্ত বলে এটিই পানীয় জলের অবলম্বন।

আমার সাংবাদিকতা জীবনের জন্যে এটি হয়তো অনেক বড় একটি অভিজ্ঞতা হতে পারে কিন্তু যখনই ভাবি, আমি এই এলাকায় এ রকম একটি পরিবেশে ক'দিন থাকতে পারব, তখনই আমার মন বলে, এখনই ফিরে যাই। আর রাজধানীতে ফিরে সেই সব কর্তাব্যক্তিদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিই, মানুষের জীবন কেমন, তারা কোন অদৃশ্য কারণে দেখেও না দেখার ভান করছেন!

আমি চলে আসতে পারিনি। কারণ আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল আরও ভয়ঙ্কর কিছু। যার বাস্তবতা মেনে নেয়া আমার মতো শহরবাসীর পক্ষে সত্যিই কঠিন।

ওই এলাকায় আমাদের চলাচলে যে সহযোগিতা করছিল তাকে বললাম, আমরা হাঁটব, মানুষের সঙ্গে কথা বলব। বাঁধটি চওড়ায় ছিল হয়তো ১৪ ফুট। ঢেউয়ের আঘাত আর স্রোতের টানে তা ভাংতে ভাংতে কোথাও ১০ ফুট আবার কোথাও ৬ ফুটে ঠেকেছে। তার ওপরই মানুষের বাস। আইলার টানে যখন হু হু করে ফুঁসে উঠেছিল নদী, আর ভাঙা বাঁধ দিয়ে চোখের পলকে

শুকনো ভূমি অদৃশ্যপ্রায়, নৌকায় ভেসে সারতে হয় গৃহস্থালির কাজ।
It is like Waterworld, except without the glamour.
PHOTO: MONEERUL ISLAM

প্রবল বেগে লোকালয়ে ঢুকে যাচ্ছিল, তখন কেউ ঘরের চালা, আবার কেউ রান্নার পাতিলটা সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন। কেউবা তিন সন্তানের মধ্যে প্রবল ঝড়-জোয়ারের তাণ্ডব থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন দু'জনকে। আর একজন ভেসে গিয়েছিল অন্তহীন জলরাশিতে।

ছোট ছোট ঘরে সাত-আটজন মানুষের একেকটি পরিবার। রান্না, ঘুম বা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার কাজটিও সারতে হয় পাঁচ ফুট বাই তিন ফুটের এই ঘরগুলোতে। ঘরের ভেতর বসে শোনা যায় নদীর কল কল শব্দ। এক গৃহকর্তা জানালেন, তাঁর কাঁচা সোনা চিংড়ির ঘের ছিল। ছিল বাচ্চাদের গায়ে জামা আর বউয়ের হাতে সোনার চুড়ি। তিন-চার বার ঘর ভেঙে যাওয়ায় জমানো সম্পদ ভেঙে খেতে খেতে এখন তিনি নিঃসপ্রায়। তাঁর দাবি- এখন হয়তো বাঁধের ওপর কোনও রকম টিকে থাকা যাচ্ছে। কিন্তু বর্ষার জোয়ারে যখন ঢেউগুলো হবে আট/দশ ফুট উঁচু, তখন বাকি বাঁধটুকুও চলে যাবে। আর তাঁদের মাথা গোঁজার সামান্য ঠাঁইটুকুও হারিয়ে যাবে। বৃদ্ধ মানুষগুলোর অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন- তাঁরা মারা গেলে সরকার কি কবর দেওয়ার জায়গা করে দেবে? না-কি জোয়ারের পানিতে ভাসিয়ে দিতে হবে তাঁর লাশ। আমি কোনও উত্তর দিতে পারিনি। শুধু বলেছি, ঢাকা গিয়ে সরকারের উপর মহলে জানানোর চেষ্টা করব।

চারিদিকে মাইলের পর মাইল নোনাপানি। কোথাও কোথাও উঁচু ভিটের ওপর সামান্য মাথা তুলে আছে ভাঙা বাড়ির ছাদ। যার ওপর দেখা যাচ্ছিল দামি সৌর বিদ্যুতের প্যানেলগুলো, যা এখনো বলছে এখানকার মানুষের জীবন এমন ছিল না।

আমি খুব বেশিক্ষণ ছিলাম না। নোনা বাতাস সমস্ত শরীর মনকে হতাশ করে তুলছিল। বেশকিছু জায়গায় ভাঙা বাঁধের ছবি তুলে আমি ফেরত এসেছিলাম। সূর্য ডোবার আগেই নদী পার হয়ে তাপানুকূল দামি গাড়িতে করে বিদেশী অর্থে গড়ে ওঠা বিলাসবহুল রেস্টহাউজে চলে আসি। তারপর 'মিনারেল ওয়াটার' দিয়ে হাত-মুখ ধুই। ভাবতে শুরু করি, কিছুক্ষণ আগে দেখে আসা মানুষ নিয়ে রিপোর্টের কথা!

ঝুমুর বারী, সিনিয়র রিপোর্টার
আর টিভি
০১/০৫/২০১০

Testimony of a cruel game

TAPOS KANTI DAS

I have covering Aila affected areas regularly for the past one year for New Age. Whenever I visit cyclone hit villages, I find everything is broken—people are living on broken embankments with broken hearts in broken houses.

The policymakers were supposed to rebuild everything within this time. But corruption among a section of people prolonged the hopelessness and frustration, which culminated into a sheer crisis of drinking water, health and sanitation.

On 25th May 2009 Aila had swallowed parts of embankments that were protecting costal villages in south-western Bangladesh. It also forced village people to come upon the broken embankments or nearby highways in Dacope, Koyra and Shyamnagar Upazaila.

After Aila, many promises were made to reconstruct embankments but the progress was very slow. Many people in those villages are still living in misery, as embankments could not be repaired. Therefore, the swelling water of the river floods many villages on a regular basis.

Jaliakhali village of Dacope Union in Khulna district is among them. It is very difficult to reach there since roads damaged during the cyclone are yet to be repaired. Edges of four-kilometer road from Kamarkhola to Jaliakhali by the river Dhaki were filled with thatched houses erected by the people who lost their homes to the mighty storm.

The embankment protecting this village was reconstructed in mid-February in 2010 at one point but high tide of water washed it away in just two days.

Locals said a contractor got the contract for reconstruction of the embankment but he assigned another sub-contractor, an influential person, to build it. Villagers blamed the breach of the embankment on substandard work by the influential man. To no surprise, it's the ruling party people who received the contract for all development works in the area. But they are using the problems of the people to grab contracts and make money.

There I met Haripada who was telling me about the increasing gap between two edges of broken embankment last year. According to him, "The gap between two edges of broken embankment protecting the JaliaKhali village was 20 feet to start with right after Aila now it has widened to a 250-feet due to the negligence of the concerned authority."

He was also frustrated with the lack of drinking water. He was holding a jug that turned yellow because of the polluted water it contained. The water was not worth drinking at all but there was no other way out for Haripada to quench his thirst. Haripada's face represents thousands of hopeless people living in that area.

The government does not need to conduct a mammoth task to bring the smile back to the face of these people. They just need to ensure pure drinking water and reconstruct of the embankment. However, these small tasks became mammoth due to the cruel corrupt nexus of a section of people. A timely decision by the related authorities and the honesty of the people in power could have mitigated their sufferings. In future to punish this cruel corruption, a stringent disaster management law is urgent.

Tapos Kanti Das, Staff Correspondent, (Khulna)
The Daily New Age
05/05/2010

গাবুরা থেকে কোপেনহেগেন আবার গাবুরা...

মনজুরুল করিম

মানুষের জীবন কতটা মানবেতর আর অসহায় হতে পারে, মানুষেরা কতটা স্বপ্নহীন-বর্ণহীন হয়ে শুধুই বেঁচে থাকার আশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে পারে, তার দৃষ্টান্ত দেখাতেই বুঝি ২০০৯ সালের ২৫ মে সাতক্ষীরার গাবুরা এলাকায় হামলে পড়েছিল প্রকৃতির দুষ্টদানব 'আইলা'।

সাংবাদিকতা করি–মানুষের কথা তুলে ধরি মানুষের কাছে। ২০০৯ এর অক্টোবরের একদিন ছুটলাম সাতক্ষীরার শ্যামনগরে। উদ্দেশ্য, আইলা-অভিঘাতের প্রায় পাঁচ মাস পর কেমন আছে সেই দুর্গত জনপদের মানুষেরা তা দেখা এবং ক্যামেরায় সবার সামনে তুলে ধরা।

খোলপেটুয়া নদী পেরিয়ে ওপারে গাবুরা। একটা ইঞ্জিন নৌকায় সঙ্গীদের নিয়ে নদী পেরোই। গাবুরার পদ্মপুকুর এলাকায় যেতে পথ খুঁজতে হয়নি। তখন জোয়ারের বেলা। মনে হলো, সেই জোয়ারই বুঝি ভাঙা বাঁধের পথ ধরে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল পাঁচ মাস ধরে দুঃসহ দুর্দশার মধ্যে টিকে থাকা মানুষদের কাছে। মনে হলো, আমাদের নৌকা নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছুনোর জন্যে ষাটের দশকে তৈরি বাঁধটি এইমাত্র ভেঙে খাল বানানো হয়েছে।

জোয়ারের পানি হু হু করে ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে। তলিয়ে যাচ্ছে মানুষের ঘর-বাড়ি, ফসলি জমি–ভেসে যাচ্ছে স্বপ্ন আর ভবিষ্যতের আশা। অনেক বাড়ির শুধু চালাটি দেখা যায়। কিছু দূর যেতে চোখে পড়ল ভেসে যেতে যেতে টিকে থাকা কিছু ঘর আর কয়েকজন মানুষ। নৌকা ভিড়ল সেখানে। জোয়ারের প্রবল স্রোতে খড়কুটোর মতো ভেঙে ভেসে যাচ্ছিল গ্রামের রাস্তা। এক বাড়ির সঙ্গে আরেক বাড়ির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বাঁশের তৈরি একটি ঘরে একজন মা তার সন্তানকে নিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জোয়ারের পানি, প্রতিমুহূর্তে কমে যাচ্ছে ঘরের আয়ু। জিজ্ঞেস করলাম, কতক্ষণ টিকবে এই ঘর? সেই নারী জানালেন, ভেসে যেতে পারে যেকোনও সময়। নিজের আর সন্তানের জীবনের ঝুঁকি থাকার পরও কেন তিনি নিরাপদ স্থানে সরে যাচ্ছেন না–কী হতে পারে এই প্রশ্নের উত্তর? নৌকা বাঁধা থাকল একটি গাছের সঙ্গে। পানি ক্রমেই বাড়ছে। আমরা সামনে এগোই। হাঁটার রাস্তা নেই, তাই কারও ঘরের ভেতর দিয়ে, কারও জানালা দিয়ে একটু একটু করে সামনে এগুচ্ছি। কয়েক ঘর পেরোতেই রাস্তা ফুরিয়ে গেল। মাত্র ১০ হাত দূরের ঘরটিতে হেঁটে যাওয়া যাবে না। কারণ মাঝের অংশটুকু এখন খরস্রোতা নদী।

৭০ বছরের আম্মাদ আলী তাঁর ঘর ঘেঁষে বসে বিষণ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন লোনাজলের দিকে। পাঁচ মাস ধরেই জোয়ারের সময় তাঁর দৃষ্টিতে এরকম অজানা আশঙ্কা। তাঁর পাশে বসলাম, জানলাম তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। সুন্দরবনে চাচাতো ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে জিতে আসার গল্প; আইলা ঘর-সংসার সবকিছু তছনছ করে দেওয়ার পর থেকে শুধু পরাজয়ের গল্প।

চোখের সামনে তখন একের পর এক নৌকার চলাচল। সবগুলোতেই ছোট ছোট অনেক কন্টেইনার। জানা গেল, নিরাপদ পানির সন্ধানে নেমেছে সবাই। আর কিছু কিছু মানুষ স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। হাঁক দিয়ে কোথায় যাচ্ছে জানতে চাইলে উত্তর আসে 'বাড়ি যাচ্ছি'। রাস্তা নেই, হয়তো নৌকাও নেই, তাই ভেসে ভেসে তাদের চলাচল। হঠাৎ দেখলাম কিছু পানিতে ডুবে ডুবে কী যেন খুঁজছে কয়েকজন! কিছু বুঝলাম না। আবার নৌকায় উঠে এগোতে থাকি সামনের দিকে। চোখের সামনে পড়া ঘরগুলোতে দেখছি মানুষ কেমন যেন বন্দির মতো বসে আছে। কোনও নড়াচড়া নেই, চলাচল নেই। কেন?- সে প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম আরো পরে। হঠাৎ একজন নারীর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ক্যামেরাম্যান জামাল। দেখলাম, পানির কিনারে বসে কাঁদছেন তিনি। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কান্নার কারণ। কাঁদতে কাঁদতে মাছুরা বেগম যা বললেন তাতেই বুঝলাম, খালের মাঝখানে কী খুঁজছিল কিছু মানুষ। তিন দিন ধরে ঠিকমতো পানি না পেয়ে, পাড়া-প্রতিবেশীদের আর নিজের পানি সংগ্রহের পাত্র একটা নৌকায় তুলে খোলপেটুয়া নদীর ওপার ছেলেকে পাঠিয়ে ছিলেন বিশুদ্ধ পানি আনতে। ডুবে গেছে সেই নৌকা, আর পানি সংগ্রহের পাত্রগুলোও।

পা আর উঠতে চায় না। তবু উঠে পড়ি। ঘর-উঠোন পেরিয়ে কাদাজল ডিঙিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে যাই। সামনে একটি টিনের ঘর, আর রাস্তা নেই। টোকা দিলাম ঘরের টিনে। উঁকি দিলেন ঘরের মালিক। নিজেদের অসহায়ত্ব নয়, আমাদের এমন অবস্থায় দেখে যেন লজ্জা পেয়ে গেলেন! খুলে দিলেন ঘরের টিনের একটা অংশ। ঘরের সামনে বাঁধা তাঁর নৌকা। অনুরোধ করলাম, খালের ওপার পৌঁছে দিতে। পৌঁছে দিলেন তিনি। নাম মনে করতে পারি না তবে চেহারা চোখের সামনে ভাসে। কারণ খাল পারাপারের জন্যে টাকা দিতে চাইলে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি। পরে তাকিয়ে দেখেছি, তাঁর ঘরের চালে সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা। বুঝলাম জীবন যত বিপর্যস্তই হোক

আত্মসম্মান ধরে রাখার চেষ্টার অন্ত নেই।

জোয়ার কিছুটা স্থির হয়েছে। নারী-পুরুষেরা নেমে পড়েছে জলে। গোসল করতে, বন্দিত্ব থেকে একটু মুক্তি পেতে। এভাবেই তারা টিকে আছে পাঁচ মাস ধরে। এভাবেই তারা লোনাপানিতে গোসল করে, সেখানেই প্রস্রাব-পায়খানাও করে। আরো অনেক পরে, তখন জোয়ারের জল নেমে যেতে শুরু করেছে। বিকেল নাগাদ পানি নেমে গেলে ফেরা কঠিন হয়ে যাবে। তাই আমরা ফেরার পথ ধরলাম। মানুষগুলো ছয় ঘণ্টা জোয়ারবন্দি থাকল, এখন জোয়ারের পানি নেমে গেলেও মুক্তি নেই, কাদায় ভরে যাবে পুরো এলাকা। নড়তে পারবে না। রাতে আবার জোয়ার আসবে। জোয়ারের শব্দ আর ভেসে যাওয়ার আশঙ্কায় নির্ঘুম রাত কাটবে তাদের। এমন জীবন হয় মানুষের? অবশ্য, এমন না হলে- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মানুষের অস্তিত্ব যে হুমকির মুখে, সে উদাহরণ তৈরি হতো কী করে?

আইলাদুর্গত মানুষের এসব যন্ত্রণার দৃশ্য টেলিভিশনের পর্দায় বহুবার দেখেছে মানুষ। উষ্ণতা, বাতাসের গতিবেগ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ইত্যাদি গবেষণা করে বিশেষজ্ঞরা অনেক আগে থেকেই বলছিলেন, বদলে যাচ্ছে জলবায়ু। কার দায়, কে বহন করছে, কার করা উচিত, ক্ষতিপূরণ দাবি–এসব নিয়ে ডিসেম্বরে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন বসল ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে। গেলাম সেখানে। উদ্দেশ্য–সাংবাদিকতা। আবার সারা পৃথিবী থেকে আসা গাবুরার মতো জায়গার লোকদের বাঁচানোর উপায় হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ঠেকাতে বিশ্ব সম্প্রদায় সত্যি সত্যি রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে একমত হতে পারেন কি-না- সেটিও দেখা যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার অসহায় মানুষগুলো এসেছিল উগান্ডা, সুদান, মালদ্বীপসহ বিশ্বের কত দেশ থেকে। সেই মানুষগুলোর ভীড়ে শোনা গিয়েছিল, সাতক্ষীরার আইলা বিধ্বস্ত জনপদ শ্যামনগরের শর্বানু নামে একজন নারীর কণ্ঠও। তিনি বলেছিলেন, থামাও জলবায়ু পরিবর্তন, আমাদের বাঁচতে দাও। শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ঘটনা সেই সম্মেলনে এসব অসহায় মানুষের কণ্ঠ কোপেনহেগেনের বেলা সেন্টারে বিশ্বরাজনীতির জমে ওঠা খেলায় হারিয়ে গিয়েছিল কি-না, সম্মেলনে প্রাপ্তিটাই বা কী- তা বিশেষজ্ঞরা ভালো বলতে পারবেন!

সম্মেলন শেষ হতে হতে ডিসেম্বরের ১৯ তারিখ হয়ে গেল। চলে এলাম দেশে। আরও দুই মাস পর, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে আবারও গেলাম সাতক্ষীরার সেই শ্যামনগর, সেই গাবুরা। ভেবেছিলাম, মে থেকে ফেব্রুয়ারি এই কয় মাসে হয়তো ভাঙা বাঁধ মেরামত করা গেছে, মাছুরা বেগম আর আম্মাদ আলীদেরও কষ্ট হয়তো কমেছে। কিন্তু না, দৃশ্য সব আগের মতোই। এই ফেব্রুয়ারিতেও গত মে মাসের মতোই জোয়ারের জল ঢুকছে বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে। এতদিনে ভেঙে গেছে আরো অনেক ঘর। এলাকা ছেড়ে গেছে আরো অনেক মানুষ। একটি কবর দেখতে পেলাম জলমগ্ন। অনেক খুঁজে পাওয়া গেল আম্মাদ আলী আর মাছুরা বেগমকে। মাছুরা বেগম নতুন নৌকা কিনতে পারেননি এখনও। আম্মাদ আলীর চোখে অন্ধকার নেমে এসেছে– মারা গেলে কবর কোথায় হবে সেই কথা ভেবে।

সেই আইলার পর থেকেই এ এলাকায় বড় বড় টাংকিতে করে খাবার পানি বিতরণ করছে এনজিওগুলো। কোনও কোনও এনজিও দিয়েছে পানি সংগ্রহের ছোট ছোট পাত্র। দেখলে মনে হবে, এসব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে কারোরই চেষ্টার কমতি নেই। কিন্তু আসল ঘটনা হলো, এইসব মানুষের অমানবিক অবস্থার একটুও পরিবর্তন হয়নি। সেই খোলপেটুয়া নদীর বুকে নৌকা করে দিনভর ছুটোছুটি করে অনেক মানুষ, শুধু একটু নিরাপদ পানির জন্যে।

খোলপেটুয়া নদী ধরে আমাদের ইঞ্জিনচালিত নৌকা চলছিল দৃষ্টিনন্দন এলাকার দিকে। পাশ দিয়ে চলা একটি নৌকাতে চোখ গেল আটকে। নৌকার পাটাতন উঠিয়ে বিশেষ কায়দায় পলিথিন বিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পুকুরের পানি। কথা বললাম তাঁদের সঙ্গে। যে দুজন বৈঠা বাইছিল তাদের একজনের নাম অমেলা খাতুন, আরেকজন আব্বাস আলী। পুকুরের পানি কেন নৌকায়

সুপেয় পানির প্রধান উৎস এসব কূপ ভরে গেছে নোনাজলে।
Water water everywhere, nor any drop to drink.
PHOTO: MONEERUL ISLAM

বাঁধভাঙা লোনাজল রেহাই দেয়নি কাউকে, জীবিত কিংবা মৃত।

Death is a great leveller. So are the flooding waters.
PHOTO: MUBASHAR HASAN

করে নিয়ে যাচ্ছেন, জানতে চাইলে যে উত্তর এলো, তাতে যতটা চমক ছিল ঠিক ততটাই আহত হলাম। পুকুরের পানি তারা নিয়ে যাচ্ছিলেন পান করা এমনকি বিক্রির জন্যেও। যাদের নৌকা নেই বা যাদের হাতে এখনো কিছু টাকা পয়সা আছে তারাই এক কন্টেইনার পুকুরের পানি ১০ টাকা করে কিনে খায়। এই কথাগুলো শুনে ভুলে যাই সব 'শুদ্ধ ভাষা'। বন্ধ হয়ে যায় দুই ঠোঁট। কিন্তু ইঞ্জিনের হৃদয় নেই। নৌকা এগিয়ে যায় 'দৃষ্টি নন্দনের' দিকে। সেই পুকুরের কাছে গিয়ে দেখলাম, পুকুরের পানিবাহী আরও অনেক নৌকা ভিড়েছে সেখানে। আর পুকুর থেকে আনা সেই খাবার পানি সংগ্রহের জন্যে সব বয়েসী মানুষের ভীষণ ব্যস্ততা।

এভাবেই চলছে এক বছর। আইলা এসে যে লোনাজল উপহার দিয়ে গেছে, তা এখনো আটকে আছে পুকুর-ডোবা সবখানে। সেসব জলাশয় থেকে লোনাজল নেমে যাওয়া তো দূরের কথা, বাঁধের যত জায়গায় ভেঙেছে তার সবগুলো দিয়ে বরং এখনও প্রতিদিনি ঢুকছে জোয়ারের লোনাজল। অবাক লাগে, একটা বছর চলে গেল অথচ লাখ লাখ মানুষের জীবনে একটু স্বস্তিও দিতে পারল না কেউ; না এনজিও, না সরকার। অথচ এসব মানুষের চাওয়া তো আকাশচুম্বী ছিল না। তাদের কেউ তো ঢাকা শহরে একটা প্লট চায়নি, কেউ তো নানা দাবি-দাওয়া তুলে রাস্তা অবরোধ করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করেনি। তারা তো শুধু চেয়েছিল, ভাঙা বাঁধগুলো মেরামত হোক, যাতে তারা আবার বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারে। কিন্তু শত প্রতিশ্রুতি আর অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন বলতে গেলে কিছুই হয়নি।

সময় গড়াতে গড়াতে আবারও চলে এলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মৌসুম। এখনও অরক্ষিত তাদের জীবন। প্রকৃতির সঙ্গে খামখেয়ালী আচরণের প্রতিশোধ এখন নিচ্ছে প্রকৃতি। আর সুন্দরবনের প্রতিবেশী এইসব মানুষ যদি পরের কোনও আঘাতে–কাজের জন্যে, বাঁচার জন্যে আরও বেশি করে শহরমুখী হয়, তখন সামলানো নিশ্চয়ই সহজ হবে না! তখন তাকেও হয়তো একটি প্রতিশোধ হিসেবে দেখবেন কেউ কেউ।

মনজুরুল করিম, স্টাফ রিপোর্টার
এনটিভি
০৭/০৫/২০১০

actionaid
End poverty Together.

care

CONCERN

CRS
CATHOLIC RELIEF SERVICES

CSRL গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান
Campaign for Sustainable Rural Livelihoods (CSRL)

Muslim Aid

nirapad

Oxfam

Save the Children

World Vision